

দুই ভাই

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশক: শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ, ৩নং, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা। মুদ্রাকর—শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস লিঃ, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬।

সমর্পণ

দেশগৌরব সুধীবর—সুলেখক, সুবাগ্মী, সুবিজ্ঞ অর্থবিদ্

কেন্দ্রীয় সরকারের যশস্বী অর্থ-সচীব

মাননীয় শ্রীঅরুণ কুমার গুহ মহোদয়ের উদ্দেশে—

কয়েক মাস পূর্বে আপনি আমার রচিত ছোটদের উপযোগী কোনও গ্রন্থের জন্য দিল্লী হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি তখন অত্যন্ত অসুস্থ, শয্যাশায়ী। অথচ, সেই সময়েই আমার রচিত এই গ্রন্থখানি কলিকাতা পুস্তকালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাপিবার জন্য প্রেসে দিয়াছেন। তখনই মনে মনে সংকল্প করি—ছোটদের উপযোগী ইতিহাসের পটভূমিকায় চিত্রিত এই আখ্যায়িকাটি মুদ্রিত হইলে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্য হইব। সেই সংকল্প আজ সার্থক হওয়ায় আমার আনন্দের অন্ত নাই। এখন আমার এই অর্ঘ্য নিজগুণে গ্রহণ করিলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। ভাল মন্দের বিচার সে ত পরের কথা। স্বাধীন ভারতের আশার প্রদীপ আজিকার ছোটরা—বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী সমাজ। ইহাদের চিত্তবিনোদনের দিকেও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল সুধীর চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে দেশবাসী শ্রদ্ধাসহকারে আপনাকেও স্মরণ করেন। সুতরাং গুণমুগ্ধ সাহিত্যসেবকের এই সামান্য উপহারটি আপনার ন্যায় নিরভিমান মনীষী গ্রহণ করিবেন, এই আশা ও আনন্দ আমাকে উৎফুল্ল করিতেছে।

42, বাগবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা—৩
জুন—১৯৫[illegible]

গুণমুগ্ধ
[illegible]
শ্রী[illegible]লাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই ভাই

এক

দারিদ্র্যের জন্য কামদেব পাঠক মহাশয় স্বগ্রামে কোন দিন কাহারও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ত পাইলেনই না, বরং মেজাজ দেখাইতে গিয়া প্রায় সকলেরই চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন।

মেজাজ বলিতে মানুষের প্রকৃতি বা মনের অবস্থা বুঝায়। দরিদ্র পাঠক মহাশয় যে প্রতিবাসীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহার দৈন্যকে মিথ্যাচারে ঢাকিয়া বাহ্যিক জাঁক-জমকের মধ্য দিয়া মেজাজ দেখাইতেন তাহা নহে; নিজের আচার ব্যবহার এবং সামাজিক ব্যাপারে তিনি সকলকে জানাইতে চাহিতেন যে, দারিদ্র্য মানুষের অপরাধ নহে, গুণানুসারে কাহাকেও মর্য্যাদা দিতে হইলে তাহার প্রকৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, দয়া-দাক্ষিণ্যাদির বিচার করা চাই, অর্থকে [illegible] [illegible] মর্য্যাদার মাপ-কাঠি করা যাইতে পারে না; [illegible] [illegible] চেয়ে [illegible] নির্ধন [illegible]; [illegible]

সমাজের ভূষণ বলা যায়। দরিদ্র যদি ধনীর দ্বারে প্রার্থী না হয়, নিজের অসচ্ছল অবস্থা এবং অভাব সত্ত্বেও সন্তুষ্ট থাকে, সাংসারিক অভাবের কথা বাহিরে ব্যক্ত না করে, অন্যের সাধ্য কি তাহার দারিদ্র্যকে উপলক্ষ করিয়া আঘাত দিতে সমর্থ হয়?

দারিদ্র্যকে এইভাবে মর্য্যাদা দিয়া সমাজে শ্রদ্ধেয় হইবার দাবী জানাইতেই দরিদ্র পাঠক মহাশয়কে সমাজের চক্ষুশূল হইতে হইয়াছে। সংস্থান এবং প্রতিপত্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা পাঠক মহাশয়কে আমল দিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন: যে ব্যক্তি গরীব, সমাজে মাথা নীচু করেই তার থাকা উচিত, ইচ্ছা করলেই সে বড় হতে পারে না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে লোকে হাসে, ভাল বলে না। জোর করে মান আদায় করা যায় না।

কিন্তু লোকের কথা পাঠক মহাশয় গায়ে মাখিতেন না, মনের জোরে মাথা উঁচু করিয়াই তিনি সমাজে চলিতেন; কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। সহস্র অভাবের মধ্যেও তিনি নিজেকে আমীরের মত মর্য্যাদাশালী মনে করিয়া তৃপ্তি পাইতেন।

ইহার ফল শেষে এমনই অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইল যে, এই অদ্ভুত প্রকৃতি মানুষটির কোন খুঁত বা [illegible]

বাহির হইলে আর রক্ষা থাকিত না, তাহা লইয়া চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া যাইত।

কথকতা ছিল পাঠক মহাশয়ের উপজীবিকা। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের আখ্যায়িকাগুলি লোক-সমাজে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার বিনিময়ে ভক্তদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যৎ-সামান্য যে দক্ষিণা ও সিধা তিনি পাইতেন, তাহাতেই কোনরূপে ক্ষুদ্র সংসারটি প্রতিপালিত হইত। স্ত্রী, এক কন্যা এবং দুই পুত্র লইয়া তাঁহার সংসার। কথায় বলে—গাঁয়ের যোগী ভিক্ষা পায় না। তাই গ্রামবাসীর আশা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে গিয়া পাঠক মহাশয়কে কথকতা-বৃত্তির সাহায্যে বিত্ত সংগ্রহ করিতে হইত। ভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখিতেন। তাঁহাদের চেষ্টায় পাঠক মহাশয়ের কথকথার খ্যাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

ইতিমধ্যে কন্যাটিও বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় সমাজপতিরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। প্রতিবাসী-মহলে ইহা লইয়া চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। যাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও দীনাতি দীন কামদেব পাঠকের দন্ত চূর্ণ [illegible] পারে নাই, তাহারা এবার মহোৎসাহে অপবাদের [illegible] [illegible] লাগিল। কিন্তু ইহাতেও পাঠক [illegible]

কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা গেল না। একদিন সহসা তাঁহার পর্ণ কুটীর হইতে শুভ-বিবাহের শঙ্খধ্বনি উঠিয়া সন্তপ্ত গ্রামবাসীকে চমকিত করিয়া দিল। যাঁহারা পাঠক মহাশয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক শাস্তির বিধি-ব্যবস্থা রচনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের বিস্ময় ও বিক্ষোভের আর অন্ত রহিল না।

আত্মপ্রত্যয় ছিল যেমন পাঠক মহাশয়ের অন্তরের অলঙ্কার, তেমনই তাঁহার অহঙ্কারের উপলক্ষ ছিল—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দুই পুত্র—রামজীবন ও রঘুনন্দন। একই বৃন্তে পাশাপাশি প্রস্ফুটিত দুইটি নয়নানন্দদায়ক ফুলের মত এই দুই ভাই তাঁহার সংসারটি সর্ব্বদাই আলোকিত করিয়া রাখিত। ইহাতেও প্রতিবাসীদের অন্তরে যেন ঈর্ষার বহ্নি ধূমায়িত হইতে থাকিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রদ্বয়ের নামের আড়ম্বর তাহাদের ভাল লাগিত না, যখন তখন টিটকারি দিয়া বলিত—'এ যেন সেই কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন আর কি!'

কথাগুলি কাঁটার মত পাঠক-গৃহিণী রত্নাদেবীর কানে [illegible] বিঁধিত। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথার সুরে তিনি বলিতেন: আমার ছেলেরা কি কাণা? আশেপাশে দশখানা গ্রামে এমন ছেলে কটা আছে শুনি?

পাঠক মহাশয় দশ জনের মুখের উপরেই জোর গলায় শুনাইয়া দিতেন—'অনেক ভেবে চিন্তেই ত ছেলেদের এমন বড় বড় নাম রেখেছি, নামের মতই দেশের মধ্যে ওরা বড় হবে তাই!'

গরীবের মুখে বড় কথা—ততোধিক আশার কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা মুখ টিপিয়া হাসিত, কত কথাই বলিত। ব্রাহ্মণের কিন্তু অখণ্ড বিশ্বাস, দুই পুত্র হইতেই তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইবে—বড় হইয়া ইহারা হিংস্র প্রতিবাসীদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করিয়া দিবে। কাজেই, ছেলেদের উপর কেহ কটাক্ষ করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

কিন্তু যাহাদের উপর তাঁহার এত বিশ্বাস এবং ভরসা, তাহাদের কেহই এ-পর্য্যন্ত কৈশোরের সীমা অতিক্রম করে নাই। জ্যেষ্ঠ রামজীবন পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, কনিষ্ঠ রঘুনন্দন তাহার চেয়ে দুই বৎসরের ছোট। কিন্তু সহসা দুই ভাইকে দেখিলে সমবয়স্ক বলিয়া মনে হয়। তাহাদের দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ গঠন, সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব, [illegible] মুখভঙ্গি প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক। এই বয়সেই মেধাবী ও সাহসী বলিয়া ছেলে দুইটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই অল্পকালে যেরূপ বিদ্যার্জ্জন করা [illegible]

নিজেদের ইচ্ছা থাকিলেও পিতার দারিদ্র্য এবং প্রতিবাসীদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাহারা এ সম্বন্ধে কোন সুযোগ পায় নাই; অথচ বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই দুই ভাই বেশ বুঝিতেছিল যে, দরিদ্র অসহায় পিতা তাহাদের সম্বন্ধে কত উচ্চ আশাই পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সন্তান হইয়া পিতার দুর্দ্দশা মোচন ও আশা চরিতার্থ করিবার মত কোন যোগ্যতাই ত তাহাদের কেহই এ-পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতে পারে নাই! লেখা-পড়া, খেলা-ধূলা, কাজ-কর্ম্ম, গল্প-গুজব—এই সকলের মধ্যেও ছেলে দুইটির অবিরাম চিন্তা, কিসে তাহারা পিতার কষ্ট মোচন করিবে?

ভাই দুইটির মধ্যে এমন সদ্ভাব যে, পূর্ব্বে যাহারা ইহাদের নামের বহর দেখিয়া খোঁটা দিয়াছে, পরে তাহারাই অবাক হইয়া বলিয়াছে—'ভা'য়ে ভা'য়ে এমন ভাব ত কখন দেখি নি, দুটি ভাই যেন পুরাণের সেই রাম ও লক্ষণ!'

কিন্তু গ্রামবাসীদের নিন্দা বা প্রশংসার দিকে এই দুইটি ছেলের লক্ষ্য দেখা যাইত না। এ সম্বন্ধে তাহারা পিতার প্রকৃতিই পাইয়াছিল। অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহারা মচকাইতে চাহিত না। এমন কতদিন ঘটিয়াছে—চাউলের অভাবে বাড়ীতে হয়ত হাঁড়িই চড়ে নাই, কিন্তু

দুই ভাই এক কোঁচড় মুড়ি আর একটু গুড় খাইয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে, তথাপি সে কথা সমবয়স্ক খেলার সাথীদিগকে ক্ষুণাক্ষরেও জানিতে দেয় নাই। আবার এমনই ইহাদের মনের জোর যে, ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিয়াও কোনদিন ইহারা পিতা মাতার উপর রাগ বা অভিমান করে নাই; বরং খাটিবার মত শক্তি-সামর্থ্য থাকিতেও পিতার কষ্টের লাঘব করিতে পারিতেছে না বলিয়া নিজেরাই কত অনুতাপ করে। যে-বয়সে ছেলেদের মাথার মধ্যে সংসারের চিন্তা প্রবেশ করিবার কথা নহে, খেলা-ধূলার দিকেই মন ছুটিয়া থাকে, এই দুইটি অদ্ভুত ছেলে সেই বয়সেই খেলা-ধূলা ভুলিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পিতার কষ্ট মোচনের কত চিন্তাই করে—অনাগত কালের উদ্দেশে কল্পনার তুলিতে আশার কত মনোরম চিত্রই আঁকিতে থাকে। ইহার ফলে ক্রমশঃই একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি ধীরে ধীরে তাহাদের কিশোর মনটি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। একদিন এমনই অপ্রত্যাশিতভাবে সেই শক্তির বিকাশ হইল যে, শুধু তাহার পিতা মাতা নহে-গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহাদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

দুই

প্রতিবাসীদের কৃপাপ্রার্থী না হইয়া কন্যার বিবাহ দিয়া যদিও পাঠক মহাশয় গ্রামশুদ্ধ সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এজন্য যে তাঁহাকে দূরবর্ত্তী গ্রামের এক মহাজনের নিকট অনেকগুলি টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল, এ সংবাদ কেহই জানিত না। এমন কি, পরিজনদের নিকটও পাঠক মহাশয় কথাটা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি এবং গুপ্ত ঋণ সকল ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন থাকে না, সময় ও সুযোগ ঘটিলেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

গ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাধিক দরিদ্র, তাহার প্রচণ্ড দম্ভ এবং অনায়াসে কন্যাদায় মুক্তির আনন্দ—কতিপয় হিংস্র-প্রকৃতি প্রতিবাসীকে এরূপ বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহারা অতিমাত্রায় উৎসাহী হইয়া অধ্যবসায়শীল গোয়েন্দার মত সন্ধান করিতে থাকে—কোথা হইতে অর্থ আহরণ করিয়া পাঠক মহাশয় এত সহজে কন্যাদায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন! প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের ফল ব্যর্থ হয় না, তহাদেরও হয় নাই। একদিন তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, প্রতিবাসীদের চক্ষুতে ধূলিবর্ষণ

করিয়া পাঠক মহাশয় দূরবর্ত্তী গ্রামবাসী এক মহাজনের নিকট হইতে উচ্চ সুদে ঋণ লইয়া এ কার্য্য এত সহজে সমাধা করিয়াছেন। তখন তাহাদের উল্লাস দেখে কে! সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রণা-সভা বসিয়া গেল এবং বহু মস্তিষ্ক-প্রসূত সিদ্ধান্ত ভিন্ন-গ্রামবাসী মহাজনটিকে জ্ঞাপন করিয়া তাহারা একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত দিন গণিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়ের প্রতি মহাজন ব্যক্তিটির শ্রদ্ধা ভক্তি যথেষ্টই ছিল। কিন্তু গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদের মুখে যখন তিনি শুনিলেন, তাঁহার টাকাগুলি জলে পড়িয়াছে, আদায় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই—তখন তাঁহারও ধৈর্য্যচুতি ঘটিল। হিসাব করিয়া দেখিলেন, ইহাদের কথা ত মিথ্যা নহে। তাঁহার সিন্ধুক হইতে টাকাগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু একটি পয়সাও ত এ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। সুদও ক্রমশঃ জমিয়া যাইতেছে। অথচ, পাঠক মহাশয় খালি হাতে আসিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র আশার কথা শুনাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া যান। কিন্তু শুধু কথায় ধৈর্য্যের বাঁধন কতদিন অটুট থাকিবে? এরূপ অবস্থায় বাড়ীতে গিয়া কড়া-তাগাদা না করিলে টাকা আদায় হইবার কোন পথ যে নাই—বাড়ী বহিয়া যে সকল

শুভানুধ্যায়ী এই পরামর্শ দিয়া গেল, তাহাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া হিসাবী মহাজনটি এই অপ্রীতিকর দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে একদিন রুদ্রমূর্ত্তিতে পাঠক 'মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টক্রমে পাঠক মহাশয় সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। একটা কাণা-ঘুসা শুনিয়া তিনিও ভিন্ন পথে এই মহাজনটিকে বুঝাইবার জন্যই তাঁহার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। গ্রামের যে সব হিতৈষী ব্যক্তি মহাজনটিকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহারাই ব্যঙ্গের সুরে নির্দ্দেশ দিল—'দেনার কথাটা প্রচার করে দাও ভায়া, হাঁক ডাক সুরু কর, হুমকি দেখাও, মানী মানুষ ত—চুপ করে থাকতে পারবে না, যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন—বেরিয়ে আসবেই।'

কুসীদ-বৃত্তি মহাজন তিনি ; পৃথিবীতে আসিয়া অর্থই চিনিয়াছেন। গ্রাম্য মাতব্বরদের কথা মতই হল্লা তুলিয়া এমন একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিলেন যে, ব্যাপার জানিবার জন্য বহু লোক অকুস্থলে ছুটিয়া আসিল। রামজীবন ও রঘুনন্দন অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া মহাজনকে অনুরোধ করিল ঃ আপনি একটু অপেক্ষা করুন। বাবা ফিরে

আসুন, তিনি এলে তাঁকেই আপনার যা বলবার বলবেন। গোলমাল করে ত কোন লাভ নেই !

গ্রামের একজন মাতব্বর মহাজনের কানে কানে বলিল ঃ ভাবনা কি তোমার, নাই বা পাঠক এল, দুই ছেলে ত সামনে দাঁড়িয়ে ; বাপকে ছেড়ে এদের ধরো, বাপের দেনা এরাই শোধ করবে ! ছেলেদের ওপর পাঠকের ভারি ভরসা আর বিশ্বাস, তা বুঝি জান না ?

একটা ক্ষণে তুচ্ছ একটা কথা হইতে পৃথিবীতে অনেক বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল। প্রতিবাসী বর্ষীয়ান্ মানুষটীর কথা কয়টী বুঝি তীরের ফলার মতই ভাই দু'টীর বুকে গিয়া বিঁধিল। তখনই তাহারা একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিল এবং এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য শক্ত হইয়া যে প্রস্তাব করিল তাহা সত্যই অপূর্ব্ব !

জ্যেষ্ঠ রামজীবন মহাজনের সম্মুখে গিয়া সবিনয়ে বলিল ঃ দেখুন, উনি ঠিক কথাই বলেছেন ; বাবার ঋণ আমরাই পরিশোধ করব। তবে আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, আজ থেকে তিনটি মাস আপনি দয়া করে সময় দিন। এর মধ্যেই আপনার সমস্ত পাওনা সুদে আসলে আমরা শোধ করবই।

প্রিয়দর্শন বালকের মুখে বিনীত অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক এমন আশ্বাসদায়ক কথাগুলি শুনিয়া মহাজনের কঠোর অন্তরটিও বুঝি তৎক্ষণাৎ দুলিয়া উঠিল। এই বয়সের ছেলের মুখে এমন কথা তিনি আর কোথাও কোন দিন শুনেন নাই। কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ক্ষণকাল নীরবে তিনি কি ভাবিলেন, তাহার পর মুখখানা তুলিয়া প্রশ্ন করিলেনঃ বাপের দেনা কি করে তোমরা শোধ কর্‌বে শুনি ?

রামজীবন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলঃ তা' জানি না। তবে যেমন করেই হোক্ বাবার দেনা আমাদের শোধ করা উচিত, এটা আমরা জানি। তাই এ-কথা বলেছি।

মহাজন এবার গম্ভীর হইয়া সুধাইলেনঃ কিন্তু যদি না শোধ কর্‌তে পারো ?

ছোট ভাই রঘুনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহার বলিষ্ঠ মুখখানি উঁচু করিয়া উত্তর দিলঃ তা' হলে আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন। বিদেশে বিক্রী করে সেই টাকায় আপনার দেনা উসুল করে নেবেন। দেখছেন তো আমি দুর্ব্বল নই !

বড় ভাই রামজীবনও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলঃ শুধু ওকে নয়, আমাকেও পাবেন; আমরা দু'ভাই আপনার ক্রীতদাস হব।

মহাজন বলিলেনঃ বেশ, আমি তিন মাস পরেই আবার আসবো।

কথাটা অবিলম্বে গ্রামময় রাষ্ট হইয়া পড়িল, অনেকেই এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। যথাসময় বাড়ীতে ফিরিয়া পাঠক মহাশয়ও সব কথা শুনিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁর মতন বেকার অক্ষম পিতার অভাব দেখিয়াই ছেলেরা এমন কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। ছেলেদের কথাগুলি তাঁর বুকের ভিতরটা যেন তোল্‌পাড় করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দুই ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেনঃ আমার ওপর অভিমান করে তোমরা যা' করেছ, তাতে আমাকে আরো বেশী ব্যথা দেওয়া হয়েছে। কেমন করে তোমরা তিন মাসের মধ্যে দেনা শোধ করবে? আর যদি দেনার দায়ে তোমরা ঐ সুদখোর লোকটার ক্রীতদাস হও, তাতে কি আমার মুখ উজ্জ্বল হবে?

রামজীবন উত্তর দিলঃ বাপের দুঃখ-কষ্ট মোচন করা ছেলের কি উচিত নয় বাবা? আপনার মুখেইত আমরা শুনেছি, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, তাই আমরাও সঙ্কল্প করেছি যে, আপনার গলগ্রহ হয়ে আর থাকব না, যাতে

আপনি ঋণমুক্ত ও সুখী হন—সেই চেষ্টাই আমরা প্রাণপণে করবো।

ছেলের মুখে এমন স্পষ্ট কথা শুনিয়া বাপের মুখখানি আনন্দে ভরিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের ভিতরটি কেমন একটা ব্যথায় যেন টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। গাঢ়স্বরে তিনি বলিলেন ঃ কিন্তু পিতার কর্ত্তব্য ত আমি তোমাদের সম্বন্ধে পালন করতে পারিনি! সব দিন তোমরা পেট ভরে খেতেও পাওনি। ভাল কাপড় কোনদিন তোমাদের গায়ে ওঠেনি। সহরে পাঠিয়ে সুশিক্ষার সুবিধাটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারিনি। আমার মত গরীবের গৃহে জন্মগ্রহণ করে তোমরা ত শুধু দুঃখ-দুর্দ্দশাই বরণ করে নিয়েছ। তবে আমি কোন্ মুখে তোমাদের কাছে সুখের প্রত্যাশা করব?

রামজীবন অবনত মুখে বিনয় নম্র স্বরে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল ঃ আপনি কেন দুঃখ করছেন, বাবা! আপনার কথা শুনে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আপনার দয়াতেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি, এমন সুন্দর দেহ পেয়েছি। আপনার কাছ থেকে আমরা এমন একটা দুর্ল্লভ বস্তু লাভ করেছি, যার আর তুলনা নেই, আমাদের জানাশুনা কোন ছেলেই যা পায়নি।

পাঠক মহাশয় অপলক নয়নে ছেলেটির মুখের দিকে

তাকাইয়া কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন: বল কি? কিন্তু এমন কি দুর্লভ বস্তু তোমদের আমি দিয়েছি, সে ত বুঝতে পারছি না!

স্নিগ্ধস্বরে রামজীবন বলিল: যে বস্তুটি আমরা পেয়েছি শুনবেন? জ্ঞান হয়ে অবধি আমরা আপনার মুখে শুনেছি—আমরা দু'ভাই বড় হবো। যতই জ্ঞান আমাদের বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ততই গভীর ভাবে ভাবতে শিখেছি—বড় হবার জন্যই আমরা জন্মেছি, বড় হবো বলেই এমন বড় বড় নাম আমাদের আপনি দিয়েছেন। বড় না হয়ে আমাদের আর উপায় নেই, দুনিয়ার মধ্যে আমরা—বড় হবই। এই ইচ্ছাটুকু আপনি মনে জাগিয়ে দিয়েছেন বলেই আমরা জোর করে আজ আপনার মহাজনকে ও-কথা বলতে পেরেছি। আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের কথা সত্যই হবে, আমরা আপনাকে ঋণমুক্ত

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময়মুগ্ধ পিতা উভয় পুত্রের উৎসাহদৃপ্ত দু'খানি মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

তিন

গ্রামখানির নাম আমহাটি। এখন উত্তর বঙ্গের রাজসাহী জেলার প্রধান নগরী নাটোরের অন্তর্গত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নাটোরের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বর্ত্তমানের নাটোর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এই আমহাটি গ্রামখানিই তৎকালে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীর অবস্থাই ছিল সচ্ছল, কেবলমাত্র কামদেব পাঠক মহাশয়ই অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্ষুদ্র একটু ভদ্রাসন, তিনখানি মাটির ঘর এবং বিঘা দুই ব্রহ্মোত্তর জমি মাত্র তাঁহার সম্বল। অবস্থা এবং উপজীবিকার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এদিকে মহাজনের নিকট ঋণমুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং পিতাকে বুঝাইয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই দুই ভাই চুপ করিয়া রহিল না। নিজেদের চেষ্টায় স্বগ্রামের পাঠশালায় যে সামান্য বিদ্যাটুকু তাহারা শিখিয়াছিল, আর বিধাতার দেওয়া যে সুবুদ্ধি তাহাদের মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত ছিল, সেই পুঁজীপাটা লইয়াই দুই ভাই ভাগ্য ফিরাইবার আশায় বাহির হইয়া পড়িবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিল।

ছোট ভাই রঘুনন্দন বড় ভাই রামজীবনকে ডাকিয়া বলিল : "দাদা, চুপি চুপিই আমাদের বেরুতে হবে; আমার ইচ্ছা নয় যে, আমরা যে-কাজের সঙ্কল্প করেছি, তা জানাজানি হয়—আর যাবার সময় কোনরকম বাধা পড়ে।"

রামজীবনও তৎক্ষণাৎ জানাইল : আমারও সেই ইচ্ছা, ভাই! কোন কিছু সঙ্কল্প করলেই অমনই মনে জেগে ওঠে চাণক্য পণ্ডিতের সেই শ্লোকটির কথা— 'মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ!' সত্য ভাই, কাজ সিদ্ধ হবার আগে মনের ছিপি খুল্‌তে নেই। যাবার সময় বিদায় নিতে গেলেই বাবা মা জোর করে জান্‌তে চাইবেন—কোথায় যাবো, কি করে দিন কাটাবো, যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন কি হবে—এমনি কত কথা। তাতে শুধু বাধাই পড়বে। তার চেয়ে চিঠিতেই প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেওয়া ভাল।'

যেমন সঙ্কল্প, তেমনই কাজ। পিতামাতার অজ্ঞাতে একদা গভীর রাত্রিতে দুই ভাই বাহির হইয়া পড়িল।

সকালেই কামদেব পাঠক দুই ছেলের হাতে লেখা নাম স্বাক্ষর করা ছোট একখানি চিঠি পাইয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন, তাহাতে লেখা ছিল—

"বাবা! মুখের কথা রক্ষা করিবার জন্য কাজের সন্ধানে আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া পড়িলাম। লোকে কোন কাজে বাহির হইবার সময় যেমন করিয়া ঠাকুর দেবতার দরজায় মাথা ঠুকিয়া সিদ্ধি কামনা করে, আমরা দুই ভাই ঠিক সেই ভাবে আপনাদের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সিদ্ধির আশায় বিদায় লইতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়; যেন মানুষের মত মানুষ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সবার সামনে আপনাদের চরণে পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে পারি।"

চিঠিখানি পড়িয়া পাঠক মহাশয় খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; চিঠির অক্ষরগুলি কুণ্ডলি পাকাইয়া যেন তাঁহার চক্ষুর উপর এই দুই দুঃসাহসী ছেলের মূর্ত্তি ধরিল—পরণে তাহাদের জীর্ণ খাঁটো কাপড়, গায়ে জামার কোন চিহ্নই নাই; কাঁধে একখানি করিয়া জ্যালজেলে গামছা, হাতে এক এক গাছি শক্ত লাঠি—যে দুইটি তাহাদের অতি প্রিয়; মুখে ও চোখে উৎসাহের উজ্জ্বল আভা! এই অবস্থায় তাহারা চলিয়াছে নিরুদ্দেশের পথে—হতভাগ্য দরিদ্র পিতার কষ্ট-মোচনের উদ্দেশ্যে। একটি পয়সাও তাহাদের সঙ্গে নাই, কি খাইয়া ক্ষুণ্ণিবৃত্তি

করিবে, কোথায় আশ্রয় লইয়া দিন কাটাইবে—সে-সব দিকে তাহাদের লক্ষ্যও নাই, মনের ভিতরে সঞ্চিত বিপুল উৎসাহ আর দুর্জ্জয় সাহসটুকু সম্বল করিয়াই তাহারা চলিয়াছে অসাধ্য সাধনে; এখন ত আর কোন উপায় নাই।

ভগবানকে স্মরণ করিয়া পাঠক মহাশয় নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। ছেলেদের এই গৃহত্যাগ ব্যাপারটি লইয়া কোন গোলমাল করিলেন না, প্রতিবেশীদিগকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানিবার সুযোগও দিলেন না; শুধু সহধর্ম্মিণী রত্নাদেবীকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন: তোমারছেলেরা কাজের সন্ধানে গিয়েছে। বলে গেছে—মানুষ হয়ে তবে ফিরবে। কিন্তু সাবধান! এই নিয়ে যেন কান্নাকাটি ক'রে লোক হাসিয়ো না, বরং মন খুলে আশীর্ব্বাদ করো—তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।'

প্রাণাধিক সন্তানদের সম্বন্ধে এমন খবর শুনিয়া কোন্ মা স্থির হইয়া থাকিতে পারেন! যে স্নেহের দুলাল দুইটিকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারিতেন না, সাংসারিক অসচ্ছলতার কষ্ট কাঁটার মত যাঁহার মনে সদা সর্ব্বদাই বিঁধিয়া আছে, সেই সন্তানরা তাঁহার অগোচরে

গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। মায়ের মন কি করিয়া স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু স্বামীকেও ত তিনি ভাল করিয়াই জানেন, ধরিত্রীর মত শক্ত হইয়া সমস্তই সহিতে হইবে; বুকের ভিতরে যতই ঝড় উঠুক না কেন, মুখে তাহার আভাসটুকুও ফুটাইবার জো নাই—মুখ দেখিয়াও যেন বাহিরের কেহই মনের কোন খবরই না জানিতে পারে। স্বামীর সংসারে আসিয়া অবধি এই শিক্ষাই তিনি স্বামীর কাছে পাইয়াছেন। তিনিও সুগৃহিণী এবং আদর্শ নারী; নিজেকে ধরিত্রীর মতন সহনশীলা করিতে অভ্যস্তা হইয়াছিলেন। তাই অনেক সময় অনাহারজনিত কষ্টও তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিয়া দিব্য হাস্যমুখে থাকিতেন, প্রসন্ন মনেই পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতেন। মায়ের এই গুণগুলি ছেলেরাও পাইয়াছিল। এমন মায়ের সন্তানরাই সকল বিঘ্ন বাধা অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া জগতে বড় হইয়া থাকে।

স্বামীর নির্দ্দেশটুকু বুঝিতে পারিয়া স্নেহময়ী মাতা মনের বেদনা মনের মধ্যেই চাপিয়া মুখখানি শক্ত করিয়া বলিলেন: আমি মা, এ অবস্থায় আমি শক্ত হতে পেরেছি, আমার গর্ভে যারা জন্মেছে—তারাও এমনি শক্ত হয়েই চলার পথে এগিয়ে যাবে, পাহাড়ও যদি তাদের সামনে

বাধা দিতে দাঁড়ায়, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়বে তাদের নিঃশ্বাসে—এই আমার আশীর্ব্বাদ !'

পাঠক মহাশয় নির্ব্বাক দৃষ্টিতে এই তেজস্বিনী সাধ্বীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন, পত্নীর দৃষ্টিতে একটা অপূর্ব্ব আলোক-দীপ্তি,—তাহার আভায় সমস্ত মুখখানি সমুজ্জ্বল। তিনি বুঝিলেন, এই আলোক-দীপ্তিই তাঁহার দৃঢ়ব্রত দুই পুত্রকে পথের সন্ধান দিবে।

চার

এই সময় পুঁটিয়ার খুব নাম ডাক। সমস্ত রাজসাহী জিলার মধ্যে পুঁটিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগরী। পুঁটিয়ার ব্রাহ্মণ রাজা রায় দর্পনারায়ণ ঠাকুর নিজের চেষ্টায় পুঁটিয়াকে সকল রকমে বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজার সুবিশাল প্রাসাদ, চকবন্দী বহির্ম্মলে সেরেস্তা, দেবালয়, অতিথিশালা, আমলাদের থাকিবার সারি সারি বাসা, চারিদিকেই যেন লোকজন গিস্ গিস্ করিতেছে। হাতীশালায় সারি সারি হাতী, আস্তাবলে শত শত ঘোড়া; প্রকাণ্ড দেউড়ীতে সিপাই শান্ত্রীর পাহারা; অসুরের মত কালো কালো চেহারা যণ্ডামার্কা একপাল বাগ্‌দী জোয়ান মাথায় লাল রঙের ফেট্টা বাঁধিয়া লাঠি হাতে সেরেস্তার সম্মুখে বিশাল প্রাঙ্গণে সদা সর্ব্বদা মোতায়েম থাকে। রাজধানীতে উৎসব লাগিয়াই আছে; খুব ঘটা করিয়া বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের উৎসব চলে। সে উৎসব শুধু লোক-দেখানো নয়, সেই সঙ্গে লোকজন খাওয়ানোর কি ধুম! রাজার ঢালাও হুকুম—আহূত-অনাহূত সকলকে সমান আদরে ভুরিভোজে খাওয়ানো হইবে, কেহই যেন না অনাহারে ফিরিয়া যায়। যেমন রাজার এই সব ব্যাপারে

ব্যয়বাহুল্যের ঘটা, ও-দিকে আবার তেমনই তাঁহার দপদপা। কেহ কোন দোষ করিলে আর রক্ষা নাই।

এক সময় রাজা দর্পনারায়ণ বাঙ্গলার সুবেদার বা শাসনকর্ত্তার সেরেস্তায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বড় বড় সামন্ত রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদার জাগগীরদার পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতেন। কেন-না, রাজা ছিলেন বাঙ্গলা-বিহার-উড়ষ্যার দেওয়ান। সুবিখ্যাত মুরশিদকুলি খাঁর আমলের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাদশাহ ঔরংজীব তাঁহার পৌত্র সাহাজাদা আজিমওসানকে বাঙ্গলার সুবেদার বা শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠান।

তৎকালে প্রধান মন্ত্রীরূপে দেওয়ানই রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুবেদার অজিম ওসানের আমলে এই বহুবাঞ্ছিত দেওয়ানের পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন—পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ রায়।

রাজা দর্পনারায়ণ যেমন কার্য্যদক্ষ, তেমনই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ছিলেন। আজিম ওসান বাদশাহের পৌত্র, তাঁহার পিতা সাম্রাজ্যের যুবরাজ; তিনিও আপনাকে ভারতবর্ষের ভাবী বাদশাহ সাব্যস্ত করিয়া খরচ-পত্রের

ব্যাপারে একেবারে বে-পরোয়া ছিলেন। রাজ্যের সমস্ত ভার দেওয়ানের উপর দিয়া তিনি পারিষদবর্গকে লইয়া আমোদপ্রমোদেই দিন কাটাইতেন, আর দুই হাতে মনের সাধে টাকা উড়াইতেন্! শুধু যে আমোদ-প্রমোদেই তিনি এত ব্যয়বাহুল্য করিতেন, সে কথা বলিলে অন্যায় হইবে। সদ্ব্যয়ও তাঁহার অল্প ছিল না। কেহ একবার সাহস করিয়া যদি তাঁহার সম্মুখে গিয়া অভাবের কথা জানাইতে পারিত, যত বড় অভাবই হৌক না কেন, উদারচেতা সাহাজাদা তখনই তাহা মিটাইয়া দিতেন। এই দানের ব্যাপারে তাঁহার কোন বাচ-বিচার ছিল না; প্রার্থী ছোট কি বড়,- হিন্দু কিম্বা মুসলমান—সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপও তিনি করিতেন না। সকল প্রজাকেই তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহার অসংখ্য কর্ম্মচারীর মধ্যে যাহারা সাহসী, বিচক্ষণ, সহৃদয় ও সুযোগ্য ব্যক্তি, তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যে ভাগ্যবান একবার সুবেদার সাজাদার সুনজরে পড়িতেন, তাঁহার সুখ-সমৃদ্ধির আর সীমা থাকিত না। কথিত আছে, দৈনিক এক সহস্র টাকাতেও তাঁহার নিজস্ব ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না।

যেমন সুবেদার আজিম ওসমান, তেমনই তাঁহার দেওয়ান রাজা দর্পনারায়ণ। খরচ করিতে উভয়েই সমান

পটু। কাজেই যতদিন তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রভুর সহিত একটি দিনের জন্যও খিটিমিটি বাধে নাই। যখনই সুবেদার সাহাজাদা পুর্জ্জা লিখিয়া পাঠাইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা তালিম করিয়া দিতেন। বুদ্ধিমান দর্পনারায়ণ জানিতেন, সাহাজাদার পুর্জ্জা ফেরৎ দিলেই অনর্থ বাধিবে। পুর্জ্জা আসিবামাত্রেই টাকার ব্যবস্থা করা চাই-ই—সে টাকার পরিমাণ যত বেশী হউক না কেন।

কিন্তু ইহার ফল শীঘ্রই অতিশয় সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। বিপুল ব্যয়ের ভারে প্রতি বৎসরই রাজস্বে ঘাঁটতি পড়িতেছিল। দিল্লীর রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তারা বাদশাহকে জানাইলেন—সাহাজাদা আজিম ওসানের আমলে বাঙ্গলা হইতে পূর্ব্বের মত রাজস্ব আসিতেছে না।

বাদশাহ ঔরংজীব তৎক্ষণাৎ শাসনকর্ত্তা আজিম ওসান এবং দেওয়ান দর্পনারায়ণের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, কেন সুবে বাঙ্গলা হইতে রীতিমত রাজস্ব ইর্শাল হইতেছে না?

সাহাজাদা আজিম ওসান রাজা দর্পনারায়ণের সহিত পরামর্শ করিয়া পৃথক পৃথক কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিলেন। সাহাজাদা জানাইলেন যে, তিনি যখন শাসনভার লইয়া বাঙ্গলা দেশে উপস্থিত হন, তখন রহিম শা ও শোভা

সিংহের বিদ্রোহে দেশ তছনছ হইয়াছিল। এখনও নানা-স্থানে বিদ্রোহীরা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাদের উচ্ছেদের জন্য বহু অর্থব্যয় হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। সেই জন্য রাজস্বে ঘাঁটতি পড়িয়াছে, রীতিমত ইর্শাল করা সম্ভব হয় নাই।

দেওয়ান দর্পনারায়ণ এই বলিয়া কৈফিয়ৎ দিলেন—দেশ এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নাই; বহু ভূস্বামী বিগত বিদ্রোহে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় আশানুরূপ মালগুজারী করিতে পারিতেছেন না। বিদ্রোহীদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য ফৌজ বাড়াইতে হইয়াছে; সুবেদার সাহাজাদা বাহাদুরকেও এখানে তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদায় থাকিতে হয়। তাহাতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই পূর্ব্বের তুলনায় রাজস্ব অনেক অল্পই পাঠানো হইয়া থাকে।

কিন্তু বাদশাহ ঔরংজীব ইঁহাদের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। সাহাজাদা আজিম ওসানের অমিতব্যয়িতার কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। প্রত্যেক সুবায় প্রচ্ছন্নভাবে বাদশাহের গোয়েন্দা থাকিত; তাহারা উল্লেখযোগ্য সকল সংবাদ বাদশাহকে জানাইত। বাদশাহ ঔরংজীব স্থির করিলেন,

বাঙ্গলা দেশে এমন একজন জবরদস্ত লোক পাঠাইবেন— যিনি তাঁহার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত এবং সাহাজাদা আজিম ওসানের অমিতব্যয়িতায় বাধা দিতে সমর্থ। সেইরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি হইলেন মুরশিদ কুলি খাঁ। বাদশাহ তাঁহাকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার সহিত নবাব-দেওয়ান উপাধি দিয়া বাংলায় পাঠাইলেন এবং আজিম ওসানকে লিখিলেন ঃ এখন হইতে বাঙ্গলার সুবেদার বা শাসনকর্ত্তার পদবী হইল—নবাব-নাজিম। তিনি রাজ্যরক্ষা ও শাসনাদি ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। কিন্তু রাজস্ব-সম্পর্কে তাঁহার কোন হাত থাকিবে না। তজ্জন্য নবাব-দেওয়ান নামে এক নূতন পদের সৃষ্টি করা হইল। বিচক্ষণ কর্ম্মচারী মুরশিদ কুলি খাঁকে নবাব-দেওয়ান পদবী দিয়া আমি সুবে বাঙ্গলায় পাঠাইতেছি। ইনি রাজস্ব বিভাগের পরিচালক হইবেন। অতঃপর নবাব-নাজিম এবং নবাব-দেওয়ানের সেরেস্তা স্বতন্ত্র হইবে। নবাব-দেওয়ানের মঞ্জুরী ব্যতীত কোনরূপ ব্যয়বরাদ্দ হইবে না, এমন কি, স্বয়ং নবাব-নাজিমও তাঁহার মঞ্জুরী ভিন্ন কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

রাজা দর্পনারায়ণ দেখিলেন, ইহার পর তাঁহাকে নবাব-দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁর অধীনেই কার্য্য করিতে হইবে।

কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া নিজের জমিদারী পুঁটিয়ায় চলিয়া গেলেন।

রাজা দর্পনারায়ণের অধীনে যিনি প্রধান কানুনগোর পদে কার্য্য করিতেন, তাঁহার নামও ছিল দর্পনারায়ণ ; তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। মুরশিদকুলি খাঁর আমলে তিনিই রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিতেন।

রাজা দর্পনারায়ণ, আজিম ওসান ও মুরশিদকুলি খাঁর সহিত বালক রামজীবন ও রঘুনন্দনের কর্ম্মজীবনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থাকাতেই বাঙ্গলার সেই সময়কার শাসনচক্রের অবস্থা অতি সংক্ষেপেই বলিতে হইল।

দুই ভাই—রামজীবন ও রঘুনন্দন স্থির করিয়াছিল, তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সরাসরি পুঁটিয়ায় যাইবে। পুঁটিয়ার রাজা দেওয়ানীর পদে ইস্তফা দিয়া নিজের জমিদারী দেখাশুনা করিতেছেন, এ খবরটুকু তাহারা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। যেমন করিয়াই হউক, রাজার সম্মুখে গিয়া তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী চাকুরী প্রার্থনা করিবে দুই ভাই ইহাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

পাঁচ

কিন্তু পুঁটিয়ায় গিয়া সেখানকার ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা যেন আকাশ হইতে পড়িল। তাহারা দেখিল, রাজার সেরেস্তার কায়দা-কানুন এমনই কঠিন ও কেতাদুরস্ত যে, রাজদর্শন ত দূরের কথা, রাজার সেরেস্তার যিনি কর্ত্তা, তাঁহার নাগাল পাওয়াও সহজ ব্যাপার নয়; আমালাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া তবে তাঁহাকে ধরিতে হইবে। আবার এ সব বিষয়ে আমলারা এতই সতর্ক যে, খুঁটিনাটি সমস্ত না শুনিয়া বাহিরের কাহাকেও তাহাদের উপরওয়ালার ত্রিসীমায়ও যাইতে দিবে না। রামজীবন ও রঘুনন্দনের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহারা কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে, ইহা প্রকাশ করিলে স্বার্থপর আমলারা তাহাদিগকে সাহায্য ত করিবেই না, বরং যথাশক্তি বাধা দিবার চেষ্টা করিবে।

রামজীবন হতাশভাবে কহিল: এখন উপায়?

রঘুনন্দন জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া যুক্তি দিল: এ ভাবে কিছু হবে না দাদা, অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল: কি করতে চাও?

কনিষ্ঠ উত্তর দিল: এদের সকলকে এড়িয়ে রাজার

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—যে সঙ্কল্প-আমরা আগেই করেছিলাম। এর জন্য আমাদের সুযোগ দেখতে হবে।

রামজীবন কহিল ঃ তোমার কথায় আমার উৎসাহ আবার ফিরে এলো; তোমার যুক্তিই ঠিক। পেছুলে চলবে না, বাধাবিঘ্ন দু'হতে ঠেলে আমাদের এগুতেই হবে।

দুই ভাই নিবিষ্টমনে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যাহারা উদ্যোগী ও অধ্যবসায়ী, সুযোগ যেন আপনা হইতেই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সেই দিনই এক অদ্ভুত বাজীকর রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাজ-সেরেস্তায় প্রবেশ করিয়া আমলাদিগকে জানাইল ঃ আমি দিল্লীর নামজাদা বাজীকর আসাদ মিঞা। আমার তৈয়ারী আতস বাজী দেখে স্বয়ং বাদশাহ খুশী হয়ে এই নাম দিয়েছেন। বাঙ্গলার নবাব-নাজিম সাহাজাদা আজিম ওসান তাঁর বেগমদের আতস বাজী দেখবার জন্য আমাকে ঢাকায় আনিয়েছিলেন। ঢাকা সহরের সমস্ত লোক আমার বাজী দেখে অবাক হয়ে গেছে। এখন রাজার নাম শুনে তাঁকে খুশী করিবার জন্য আমি আমার বাজীর সাজসরঞ্জাম সব নিয়ে এখানে এসেছি।

বাজীকরের কথায় আমলাদের মুখগুলি এবার আর

গম্ভীর হইয়া উঠিল না, তাহারা দিব্য প্রসন্নভাবেই আগন্তুককে খাতির করিয়া সেরেস্তার কর্ত্তার নিকট লইয়া গেল। রাজার নিকট এ সংবাদ পাঠাইতেও বিলম্ব হইল না। রাজা অন্তঃপুর হইতে হুকুম দিলেন যে, বাজীকর ও তাহার সঙ্গের লোকজনদের বিশ্রাম ও আহারাদির ব্যবস্থা করা হউক, সন্ধ্যার পর বর্হির্মহলের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে তিনি তাঁহার বাজীর কসরৎ দেখাইবেন, রাজাও উপস্থিত থাকিবেন। রাজধানীর সকলেই যাহাতে এই উৎসব দেখিতে পায়—ঢেঁড়া দিয়া তাহার খবর সকলকে জানাইয়া দেওয়া হউক।

রামজীবন ও রঘুনন্দন রাজদর্শনের অনুমতি না পাইলেও রাজার অতিথিশালায় সযত্নে আশ্রয় পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে রাজার বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাজবাড়ীর বহির্মহলের বিশাল প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত হইয়া উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত প্রাঙ্গণটি লোকে ভরিয়া গেল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে শত শত দীপ জ্বলিয়া উঠিল। উৎসবপ্রাঙ্গণের এক অংশে রাজা ও তাঁহার অন্তরঙ্গদের জন্য কতকগুলি আসন সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। দলবলে রাজা আসনগ্রহণ করিতেই বাজীকর আসিয়া

মিঞা রীতিমত কুর্ণিশ করিয়া রাজার নিকট তাহার বাজী দেখাইবার অনুমতি চাহিল। রাজা প্রসন্নমনে অনুমতি দিতেই বাজীকর তাহার অদ্ভুত বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রায় একটি ঘণ্টা ধরিয়া আকাশপথ আলোকিত করিয়া আসাদ মিঞার আতস বাজীর উৎসব চলিল। কত সব জীবজন্তু, কত প্রকারের গাছ ও ফুল উজ্জ্বল আলোর আকারে আকাশপথে দেখা দিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দিল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে বাজীকরের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজাও পরম পরিতুষ্ট হইয়া আসাদ মিঞাকে একখানি মূল্যবান শাল এবং পঞ্চাশটি আসরফি পুরস্কার দিলেন।

ঠিক এই সময় জনতার ভিতর দিয়া রামজীবন ও রঘুনন্দন অতি সন্তর্পণে একেবারে রাজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলকে চমৎকৃত করিয়া কহিল ঃ রাজার কাছে আমাদের একটা আর্জ্জি আছে।

রাজা চমকিত হইয়া এই দুঃসাহসী বালক দুইটার মুখের দিকে চাহিলেন। সেরেস্তার আমলারা নিকটেই ছিল, ছেলে দুটিকে তাহারা চিনিল এবং এরূপ বেয়াদপি দেখিয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর

তাহাদিগকে বাধা দিবার বা রাজার সম্মুখ হইতে ফিরাইবার উপায় ছিল না।

রাজা কিন্তু আমলাদের দিকেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এরা কে ?

রামজীবন হাত দুইখানি যোড় করিয়া কহিল ঃ আমাদের পরিচয় ত ওঁরা নেন নি, কি করে বলবেন— আমরা কে ? গরীব জেনে অতিথিশালা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

রঘুনন্দন কহিল ঃ কিন্তু আমরা রাজদর্শনের আশাতেই এঁসেছি। সে আশা আমাদের পূর্ণ হয়েছে।

ছেলে দুইটীর সাহস, সপ্রতিভ ভঙ্গি ও সুস্পষ্ট কথায় রাজা মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলেন; তাঁহার ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। স্নেহের স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের আর্জিটা কি ?

রামজীবন কথাটা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, প্রশ্ন শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল ঃ একটু আমোদের জন্য আমাদের চোখের উপর অতগুলো টাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো; রাজা খুসী হয়েই দিলেন। কিন্তু রাজার জমিদারীতে এমন প্রজাও আছে, পেট ভরে যারা দুটি বেলা খেতে পায় না,—গুটিকতক টাকার জন্যে দেনার

দায়ে যাদের সুদখোর মহাজনের ক্রীতদাস না হয়ে উপায় নেই!

রাজার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। রামজীবনের কথাগুলি বুঝি তীরের ফলার মত তাঁহার বুকে বিধিল। তিনি বুঝিলেন, প্রিয়দর্শন এই দুইটি বালকের সহিত এমন একটা কাহিনী জড়াইয়া আছে যাহা অতিশয় অপ্রীতিকর ও মর্ম্মান্তিক। রাজার অন্তর গভীর বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন: তোমাদের কাহিনী আমি শুনতে চাই। যদি বুঝি, আমার তরফ থেকেই অন্যায় কিছু হয়েছে, নিশ্চয়ই তার প্রতিকার করবো। আর যদি দেখি তোমরা মিথ্যা বলেছ, তাহলে তোমাদেরও নিষ্কৃতি নেই জেনো।

রঘুনন্দন তখন করযোড়ে কহিল: সব কথা সবার সামনে বলা চলে না; আমরা শুধু রাজাকেই সে কাহিনী শুনাতে চাই।

রাজা খুশী হইয়া বলিলেন: বেশ, তোমরা আমার সঙ্গে এস, নির্জ্জনেই আমি তোমাদের কথা শুনবো।

রাজার পারিষদ ও সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণ দুইটি অপরিচিত বালকের প্রতি রাজার এরূপ সহানুভূতি দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইল। ছেলে দুইটির মিষ্ট স্বভাব, সুন্দর

আকৃতি, সাহস, দৃঢ়তা ও বাক্‌পটুতায় রাজা সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেও, ইহারা তাহাদিগকে মোটেই পছন্দ করে নাই। বাহিরের দুইটি ছেলে আসিয়া রাজার স্নেহভাজন হয়—এই চিন্তাটুকুও যেন তাহাদের পক্ষে অসহ্য।

কিন্তু বিধাতার যাহা অভিপ্রেত, মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ব্যর্থ করিতে পারে না। রাজা দর্পনারায়ণ রামজীবন ও রঘুনন্দনের মুখে সকল কথা আগ্রহ সহকারেই শুনিলেন। তিনি নিজেই লোক চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ যে, মিথ্যা বাকপটুতায় তাঁহাকে ঠকাইবার কাঁহারও সাধ্য ছিল না। মানুষের মুখ দেখিয়া ও মুখের কথা শুনিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে যেরূপ মোটামুটি আভাষ দিতেন তাহার অন্যথা কদাচ হইত না। এই অদ্ভুত দুইটি বালকের সহিত কথোপকথনে অনেকটা সময় কাটাইয়া মনবিদ্‌ রাজা ইহাদের মানসপটে ভবিতব্যের তুলিকায় অঙ্কিত ভাবী কালের কিরূপ চিত্র দেখিয়াছিলেন—তাহা মুখে প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা পরম শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকের মতই মনোজ্ঞ।

রাজা গম্ভীরভাবেই এই দুটিকে বলিলেন: তোমাদের সাহস আছে, বড় হবার আগ্রহও আছে। কিন্তু শুধু

ভাবে বিভোর থাকলেই আগ্রহ পূর্ণ হয় না। 'আমরা বড় হবো'—এই যে আকাঙ্খা, একে সিদ্ধ করতে চাই, বড় হবার মত উপযুক্ত শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, আর—তার সঙ্গে সাহস। 'তোমাদের সাহসটুকুই শুধু আছে, আর কিছু নেই। বড় যদি হতে চাও, উপযুক্ত সন্তান হয়ে বাপ মা'র দুঃখ মোচনের ইচ্ছা থাকে, মানুষের মত মানুষ হয়ে যদি মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে বাসনা রাখ, তাহলে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা আরম্ভ কর, সাধনার পথে প্রয়োজন শিক্ষা ও দীক্ষা, তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

সঙ্গে সঙ্গেই কথামত কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। স্থির হইল যে, দুই ভ্রাতা রাজবাড়ীতে থাকিয়া রাজপুত্রদের মতই প্রতিপালিত হইবে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে বিদ্যাভ্যাস করিবে।

ছয়

দুইটি মাস এইভাবে কাটিল। দুই ভাই রাজবাড়ীতে যত্নে আদরে বাস করিতে লাগিল। বিচক্ষণ শিক্ষকগণ তাহাদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেন। বাঙ্গালীর ছেলে, পাঠশালায় পড়িয়া বাঙ্গলা পড়াশুনা কিছু কিছু করিয়াছিল, কিন্তু ফারসী তাহারা মোটে শিখে নাই। অথচ ফারসীই সে সময়কার রাজভাষা, তাহা ভাল করিয়া না শিখিলে নবাব-দরবারে বা কোন প্রতিষ্ঠানে কোনরূপ কাজকর্ম্ম পাওয়া কঠিন। বড় ভাই রামজীবনের বেশী আগ্রহ অঙ্কের দিকে। দুই মাসের মধ্যেই সে অঙ্কশাস্ত্র মোটামুটি রকমে শিখিয়া ফেলিল। ছোট ভাই রঘুনন্দন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া শিক্ষকমহাশয়গণকে চমৎকৃত করিয়া দিল। যে মৌলভি বালকদিগকে ফারসী পড়াইতেন, তিনি রঘুনন্দনের মেধা, শিক্ষানুরক্তি ও ফারসীভাষায় আশ্চর্য্য রকমের উচ্চারণশক্তি দেখিয়া রাজার নিকট তাহার বহু প্রশংসা করিলেন। সেকালে বড়লোকের ছেলেরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে রীতিমতভাবে শক্তিচর্চ্চাও করিত; লাঠি ছোরা, সড়কি, তরবারি, তীর-ধনুক বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র চালনার কৌশলও তাহাদিগকে শিখিতে হইত। রামজীবন

ও রঘুনন্দন এই শিক্ষারও সুযোগ পাইল। তাহারা শৈশব হইতেই সাহসী, তেজস্বী ও বলিষ্ঠ ছিল, শক্তিচর্চ্চায় তাহাদের মনের উৎসাহ আরও প্রবল হইল।

কিন্তু রাজবাড়ীর আদর যত্নের আবেষ্টনে থাকিয়াও একটা দুশ্চিন্তা সর্ব্বদাই তাহাদের মনে কাঁটার মত বিঁধিতে ছিল। তাহারা সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছে—মানুষ হইয়া বাড়ী ফিরিবে। কিন্তু মানুষ হইতে তাহাদের অনেক বিলম্ব, তাহার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তাহারা দুটী ভাই না-হয় সুখে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের ঋণগ্রস্ত নিঃস্ব পিতার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ত করিতে হইবে। দুই ভাই যদি মানুষ হইবার জন্য এইভাবে কঠোর সাধনায় দেহ মন নিয়োগ করে, কত বৎসরই তাহাতে কাটিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের পিতামাতার কি ব্যবস্থা হইবে? তাঁহারা কি পুত্রদের আশা-পথ চাহিয়া বায়ুভক্ষণ করিয়া দিনযাপন করিবেন?

সারাদিন নানাবিধ শিক্ষাগ্রহণ করিতেই অতিবাহিত হয়, রাত্রিকালে দুইভাই একত্র বসিয়া এই সব আলোচনা করে। তাহাদের চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠে নিত্য অভাবগ্রস্ত পিতার বিষণ্ণ মলিন মুখ, প্রতিবেশীদের নানারূপ বিদ্রূপ,

পাওনাদারদের কঠোর তাগিদ। যে মহাজনের নিকট জোর গলায় তাহারা ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহার সেই রুক্ষ রুষ্ট মুখখানা যেন ভ্রূকুটি করিতে থাকে। দুই মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হইতে বেশী বিলম্ব ত আর নাই; কিন্তু কি করিয়া তাহারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে? আর যদি তাহারা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষা সাধনা সমস্তই ব্যর্থ হইবে—সত্যরক্ষা করিতে ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে নামিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে!—এইরূপ দুশ্চিন্তায় দীর্ঘরাত্রি অতিবাহিত হয়, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। অবশেষে গভীর রজনীর শীতল নির্ম্মল বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া চিন্তাশ্রান্ত ভাই দুইটিকে সুপ্তিমগ্ন করিয়া দেয়।

এই অবস্থায় একদিন রামজীবন ধীরে ধীরে রাজার খাস কামরায় ঢুকিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তখন একাকী বসিয়া একটা হিসাব দেখিতেছিলেন। রাম-জীবনকে অসময়ে এভাবে আসিতে দেখিয়া তিনি অপ্রসন্ন-গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,ঃ আজ পড়তে যাওনি তুমি?

মুখখানি কঠিন করিয়া দৃঢ়স্বরে রামজীবন উত্তর দিলঃ

পড়াশুনায় আমি মনোনিবেশ করতে পারছি না; তাই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

রাজা এবার সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে রামজীবনের দিকে চাহিলেন, তাঁহার অন্তর্ভেদি দৃষ্টিদ্বারা স্পষ্টই বুঝিলেন, বালক কোন দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সঙ্কল্প হইতে কেহ বুঝি তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। সেই সঙ্কল্পের প্রভা যেন তাহার সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই; রাজার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি সহ্য করিয়াও রামজীবন তাঁহার সম্মুখে অবিচলিতভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আমি ত আগেই বলেছি রামজীবন, শিক্ষা ভিন্ন মানুষ কখন বড় হতে পারে না। শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েও তুমি তাকে অবহেলা করছ কেন?

রামজীবন ধীরে ধীরে নম্র কণ্ঠে উত্তর করিল,—ইচ্ছা করে আমি পাঠাভ্যাসকে অবহেলা ত করিনি; অল্প সময়ের মধ্যে উপার্জ্জনের মত শিক্ষা পাবার জন্য মনের সমস্ত উৎসাহ দিয়ে আমি শুধু অঙ্কের সাধনা করেছি। এ সাধনায় আমি সিদ্ধি পেয়েছি বলেই আমার ধারণা। এখন আমি

রাজা বলিলেন : বুঝতে পেরেছি, তোমার মাথায় এখন উপার্জ্জন করবার ফন্দী ঢুকেছে, চাকরী চাও।

রামজীবন আস্তে আস্তে মুখখানি নত করিল; কোন উত্তর দিল না।

রাজা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন : তুমি কি মনে কর—চাকরী পাওয়াটা খুব সহজ ? তা ছাড়া, চাকরী করবার মত লায়েক তুমি হয়েছ !

রামজীবন মুখখানি তুলিয়া নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর করিল : রাজ-সরকারের সেরেস্তায় হিসেবের কাজ আমি চালাতে পারবো, আমার হাতের লেখাও ভালো ; আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।

রাজা মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলেন : চাকরী না-হয় একটা কিছু পেলে কিন্তু এই পাওয়াটাই কি খুব বড় কথা ? গোটা জীবনটা ছোট একটা চাকরীর ভিতর দিয়েই কাটিয়ে দিতে চাও ?

রামজীবন করযোড়ে কহিল : কিন্তু এরই উপর আমাদের সর্ব্বস্ব যে নির্ভর করছে রাজা ! আজ যদি আমি ছোট একটি চাকরী পাই, তাতেই একদিন হয়ত বড় হতে পারবো ; আমার ভাইটি ভাল করে পড়াশুনা করে মানুষ হতে পারবে : আমার বাপ মা'র কষ্টও হয়ত লাঘব হবে।

নতুবা সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে। আর কিছুদিন পরে আমাদের কোন স্বাধীনতাই থাকবে না, আমাদের জীবন বন্ধক আছে বাবার মহাজনের কাছে। তাঁর ঋণ শোধ করতে না পারলে আমাদগকে তার ক্রীতদাস হ'তে হবে।

রাজা বলিলেন ঃ প্রথম দিনেই এ সব কথা তুমি বলেছিলে বটে! কিন্তু তাতে কি হয়েছে? মুখের একটা কথাতেই তোমরা সেই সুদখোর মহাজনটার ক্রীতদাস হয়ে যাবে! তার সাধ্য কি তোমাদের কোন অনিষ্ট করে—যখন তোমরা আমার আশ্রয়ে আছ।

রাজার কথায় রামজীবনের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে ধীর স্বরে বলিল ঃ কিন্তু আমরা যে কথা দিয়েছি রাজা, সত্যে আমরা বন্দী। তিনটি মাস যেদিন পূর্ণ হবে—তার পরদিন আমাদের আর কোন স্বাধীনতাই থাকবে না।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কিন্তু আজ যদি তুমি চাকরী পাও, তাহলেও এ স্বাধীনতাটুকু কি করে বজায় রাখবে?

রামজীবন বলিল ঃ আমার জীবন রাজার কাছে বন্ধক রেখে সেই টাকায় মহাজনের দেনা শোধ করবো।

রাজা বলিলেন ঃ বেশ, তোমার জীবনটা আমার কাছে বন্ধক রেখে তুমি পড়াশুনাই কর; আমি ঐ দেনা শোধ,

করে দিচ্ছি। এর পর মানুষ হয়ে তুমি দেনা শোধ, করো আর তোমার জীবনটাকেও খালাস করে নিয়ো।

তথাপি রামজীবনের মুখে হাসি ফুটিল না, বা তাহাকে খুশী হইতে দেখা গেল না। পুনরায় সে হাত দুইখানি যোড় করিয়া বলিল ঃ আপনার ঋণের বোঝা ক্রমেই যে বেড়ে চলেছে রাজা? টাকায় ত এ ঋণ শোধ দিতে পারবো না ; আজ যে মুখ তুলে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করবার জন্য চাকরীর কথা তুলতে পেরেছি—সেও ত আপনারই দয়ায়। এখন শুধু এই প্রার্থনা করি—পড়াশুনার জন্য আমাকে আর পীড়াপিড়ী না করে যাতে আমি দু-পয়সা উপার্জ্জন করতে পারি—তারই উপায় করে দিন রাজা! যে কোন একটি চাকরী পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ চাকরী যেন দিলুম, কিন্তু কি রকম বেতন তুমি প্রত্যাশা কর?

রামজীবনের গলার স্বর এবার গাঢ় হইয়া আসিল, সে বলিল ঃ মহাজনের এই দেনাটি শোধ হয়ে যায়, আর আমার ভাইটি মানুষ হয়, এই সর্ত্তে আমি চাকরি চাই রাজা! এর উপর কোনদিন পয়সার কোন দাবী জানাব না—সারা জীবন ধরে এই দেনাই শোধ করবো।

রাজা বলিলেন ঃ কিন্তু তোমার জীবনটাকে আমিই

না এমন করে বেঁধে রাখবো কেন! আর, তুমি যখন স্বাবলম্বনের সঙ্কল্পই করেছ, পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জ্জন করতে ব্যস্ত হয়েছ, তখন নিজেকে এতটা খাটো করবেই বা কেন? সত্যনিষ্ঠ দৃঢ়প্রতীজ্ঞ স্বাবলম্বী যে হয়, তার চলার পথ মুক্তই থাকে; কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। যাই হোক, আমি এখনি তোমার শিক্ষার পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করছি। পরীক্ষায় যদি তুমি উত্তীর্ণ হতে পারো, যোগ্যতার উপযুক্ত পুরস্কারই পাবে; নতুবা পুনরায় তোমাকে পাঠশালায় ফিরে যেতে হবে জেনো।

তখনই রাজা সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া রামজীবনের পরীক্ষা লইবার আদেশ দিলেন। রামজীবন তাঁহার সহিত আমলাখানায় উপস্থিত হইল। অল্পবয়স্ক বালক হিসাব সংক্রান্ত কঠিন কাজগুলি এত শীঘ্র শিখিয়া ফেলিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে পরীক্ষা দিতে বুক বাঁধিয়াছে শুনিয়া আমলারা ত হাসিয়া অস্থির!

কিন্তু রামজীবন যখন প্রত্যেক অঙ্কটি নির্ভুল ভাবে কষিয়া ফেলিল, উপরন্তু কেমন করিয়া জমিদারী সেরেস্তার খোকা লিখিতে হয়; কিরূপ কৌশলে জমা-খরচ সংক্রান্ত রেওয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার আদর্শ নিখুঁতভাবে দেখাইয়া দিল, এবং চিঠির সুন্দর মুসাবিদায় মুক্তার মত

অক্ষরগুলি সাজাইয়া গেল ; তখন আর কাহারও মুখে কথা নাই !

প্রধান কর্ম্মচারীর মুখে রামজীবনের কৃতিত্বের কথা শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহার হিসাব ও মুসাবিদার আদর্শ দেখিয়া রাজা বলিলেন ঃ এ ছেলের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল; কালে মস্ত লোক হবে।

তখন রামজীবনকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন ঃ হিসাবের পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ রামজীবন ; আজ থেকে তুমি সদর সেরেস্তায় মুহুরীর কাজে বাহাল হলে। তোমার বেতন মাসিক সাত টাকা মঞ্জুর করা গেল। যে মহাজনের কাছে তোমরা দুই ভাই সত্যবদ্ধ আছ, তার যা কিছু পাওনা—সেরেস্তা থেকেই মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার বেতন থেকে মাসিক তিন টাকা করে সেরেস্তা কেটে নেবে। বাকি চার টাকা প্রতিমাসে তুমি পাবে। ইচ্ছা করলে সেই টাকা তোমার বাবার কাছে পাঠাতে পারো। তোমাদের দুই ভ্রাতার খোরাক পোষাকের ভার সেরেস্তাই বহন করবে।

রামজীবন এতটা প্রত্যাশা করে নাই। তখনকার দিনে মাসিক চার টাকায় একটি বড় সংসারের সকল ব্যয় স্বচ্ছলভাবে নির্ব্বাহ হইত। নিজের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে

ঋণমুক্ত এবং পিতার দুর্গতি নিষ্পত্তির এমন ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই। অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহার সমস্ত অন্তরটি ভরিয়া গেল। সেই বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাস তাহার অন্তর মঁথিত করিয়া মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বাষ্পাচ্ছন্ন ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটি রাজার মুখের উপর তুলিয়া ভাবগদগদস্বরে কৃতজ্ঞ বালক বলিল: এ ঋণ আমি কেমন করে শোধ করবো রাজা !

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন: একে তুমি ঋণ ভাবছ কেন? না হয় তোমাকে কিছু আগামই দিয়েছি; তুমি খেটে শোধ দেবে। সত্য আর সততার দিকে যার লক্ষ্য থাকে, তার কোন কাজই আটকায় না, একটা না একটা উপায় এসেই যায়। তবে এ কথাও তোমাকে বলছি রামজীবন, সেরেস্তার কাজে ঢুকলেও লেখাপড়ার চর্চ্চা যেন ছেড়ো না; সেরেস্তার কাজ বজায় রেখে—পড়াশুনাও করবে। একদিন এর প্রয়োজন বুঝতে পারবে।

রামজীবন নীরবে কথাগুলি শুনিল, পরে আস্তে আস্তে রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার পদতলে মাথাটি নত করিয়া দিল।

রাজা স্নেহভরে তাহাকে তুলিয়া কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন: এ দিন তোমার থাকবেনা রামজীবন, একদিন তুমি সত্যই বড় হবে; তোমার মুখখানার উপর চেয়ে আমি যেন তোমার সেই ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি।

সাত

সেইদিন হইতেই রামজীবন সেরেস্তার কাজে বহাল হইল। সেরেস্তার অধিকাংশ আমলাই রামজীবনের এই সৌভাগ্যে অসন্তুষ্ট হইল। কত আমলাই ত রাজার সেরেস্তায় বহু বৎসর ধরিয়া কলম পিষিতেছে, কিন্তু তাহাদের বেতনের পরিমাণ এ পর্য্যন্ত পাঁচের কোঠাতেও উঠে নাই। কেহ পান দুই, কেহ তিন, কেহ চার, তাহাও প্রতি বৎসরে এক আনা দুই আনা হিসাবে ধাপে ধাপে দুই তিন বা চারি টাকায় উঠিয়াছে। পাঁচ টাকা বা তাহার কিছু বেশী বেতন যাঁহারা পান, তাঁহারা সদর সেরেস্তার মাতব্বর আমলা। আর যাঁহারা সাত টাকা বা তাহার বেশী পান তাঁহারা ত উপরওয়ালদের সামীল। তখন চালের দর মন প্রতি দু আনা, এক মুঠা কড়ির বদলে এক লোটা খাঁটি দুধ পাওয়া যাইত। একটি পয়সার বাজার ছিল একটা যোয়ান মুটের বোঝা। সুতরাং যিনি মাসে সাত টাকা রোজগার করিতে পারিতেন, তাঁহার আবার ভাবনা কি? লোকে তাঁহাকে ভাগ্যবান বলিয়াই ভাবিত।

কাজেই কিশোর বয়স্ক রামজীবনের সৌভাগ্য দেখিয়া বয়স্ক আমলাদের ত রাগ হইবারই কথা! কোথা হইতে

উড়িয়া আসিয়া একেবারে তাহাদিগকে টপকাইয়া কিনা মোটা মাহিনার চাকুরীতে পাকা হইয়া বসিল! শুধু তাহাই নয়, রাজার খরচায় তাহার পড়াশুনারও ব্যবস্থা বজায় রহিল। আহারাদির কথাটা আর তাঁহারা ধরেন নাই; কেননা, সে সময় রাজা বা ভূস্বামীদের সেরেস্তায় যাঁহারা কাজকর্ম্ম করিতেন, কর্ম্মচারী হইতে পাইক পিয়াদা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই দুই বেলার আহারের ব্যবস্থা প্রভুর আলয়েই থাকিত। প্রভুরা ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন। কর্ম্মচারীবর্গকে তাঁহার পরিবারভুক্ত ভাবিয়া তাহাদের সুখ সুবিধার দিকে প্রভুরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

রামজীবন ও রঘুনন্দন সেরেস্তার অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মতই প্রভুর আদর যত্ন পাইত। এ দিকে রাজা দর্পনারায়ণের কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতেন, যোগ্যের আদর করিতেন বটে, কিন্তু আহারাদির ব্যাপারে যোগ্য বা অযোগ্য, বড় বা ছোট, এ সকল বিচার আসিত না। এখানে প্রত্যেকের প্রতিই যাহাতে সমান আদর ও সমান ব্যবহার করা হয়. সেদিকে থাকিত রাজার অতি সতর্ক দৃষ্টি।

আবার সেরেস্তার কাজকর্ম্মের ব্যাপারে রাজার এই দৃষ্টি

যেন একেবারে বদলাইয়া যাইত। সুদক্ষ উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চিনিয়া লইয়া রাজা তাহাকেই দিতেন প্রাধান্য। বয়সের হিসাব করিয়া, বর্ণ বা জাতি বিচার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি যোগ্যতা যাচাই করিতেন না; এখানে দেখিতেন—কাহার কিরূপ কৃতিত্ব, গুণানুসারে কাহার কোথায় স্থান। রামজীবনের গুণের পরিচয় পাইয়াই তিনি তাহাকে পুরাতন ও বয়স্ক কর্ম্মচারীদের উপরে এইভাবে তুলিয়া দিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীরা সামান্য এক বালক জ্ঞানে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে রামজীবনকে দেখিয়াছিল; কিন্তু এই বালকের ভিতরে কত বড় একটা বলিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী মন জাগ্রত হইয়া আছে- ইহারা ত তাহা দেখে নাই, দেখিয়াছিলেন রাজা দর্পনারায়ণ। তাই তিনি এই ছেলে-টিকে কোলের কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলিতে পারিয়া-ছিলেন—এ দিন তোমার থাকবে না রামজীবন, একদিন তুমি সত্যই বড় হবে।

কিন্তু রাজার এই কথাটিও সেরেস্তার হিংসুটে আমলারা অন্যভাবে ধরিয়া লইয়া রামজীবনকে ক্ষেপাইবার একটা ফন্দি বাহির করিল। রাজা বলিয়াছেন—রামজীবন একদিন বড় হইবে। সুতরাং তাহারা এখন হইতেই রামজীবনকে বড় করিয়া দিল; পরামর্শ করিয়া রামজীবনের নামকরণ করিল—

বড় রাজা। কেহ ‘বড়’ কথাটা বদলাইয়া ‘মহা’ করিয়া লইল। রামজীবনকে দেখিলেই চাপা বিদ্রূপের সুরে কেহ ‘বড় রাজা’ কেহ বা ‘মহারাজা’ বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিল। শেষে অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, রাজা, রাজপরিজন ও সেরেস্তার বড় কর্ত্তা ভিন্ন আর সকলের নিকটেই রামজীবনের নামের বদলে ‘মহারাজা’ নামটাই পরিচিত হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত রাজার কানেও উঠিল। রাজা সব শুনিলেন, শুনিয়া মুখখানা গম্ভীর করিলেন ; কিন্তু কাহাকেও এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না।

রামজীবনও ইহার প্রতিবাদ করিত না। সে যেন অন্যের নিন্দা বা উপহাসে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল। যতক্ষণ সেরেস্তায় থাকিয়া সে কাজ করিত, কাজ ছাড়া আর কোন দিকেই তাহার নজর পড়িত না। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা কত গল্প করিত, ঠাট্টা কৌতুক লইয়া হাসির কত হুল্লোড় তুলিত ; কিন্তু রামজীবন নির্ব্বিকার—সে যেন কানে তুলা গুঁজিয়া খাতার হিসাবের ভিতর ডুবিয়া আছে, বাহিরের কিছুই তাহার কানে ঢুকিতেছে না।

অন্যান্য কর্ম্মচারীরা রামজীবনের এই নির্লিপ্ত অবস্থা

দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল : বয়সে কাঁচা হলে কি হবে, ছোকরার সমস্ত মনটাই পাকা, ওকে দেখলেই মনে হয়, ষাট বছরের একটা সন্ন্যাসী ছেলে হয়ে সেরেস্তায় বসেছে।

একদিন বৈকালে রাজবাড়ীর বিশাল প্রাঙ্গণে এক যাদুকর তাহার নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণ জনতায় ভরিয়া গিয়াছে। বিশাল প্রাসাদে যে যেখানে ছিল, খেলার বাজনা শুনিয়াই সকলে উঠানে আসিয়া জমিয়াছিল। রাজাও পরিজনবর্গের সহিত বাড়ীর দোতালার বারান্দায় বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন। খেলা শেষ হইবার একটু আগে কি মনে করিয়া তিনিও উঠানে নামিয়া আসিলেন। রাজাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল। রাজা আমলাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : রামজীবন কোথায় ? তাকে ত দেখছিনে !

একজন আমলা সঙ্কুচিতভাবে জানাইল : সে ত আসে নি হুজুর ? সেরেস্তায় বসে কাজ করছে।

রাজা মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিলেন : তাকে ডাকত।

রাজার আহ্বান শুনিয়া একটু পরেই রামজীবন আসিল। মুখখানি তাহার স্বচ্ছ ও নির্ম্মল—উৎকণ্ঠার কোন চিহ্নই

তাহাতে নাই। অসঙ্কোচেই সে রাজার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি করছিলে তুমি সেরেস্তার ভিতর একলাটি বসে ?

দিব্য সহজ কণ্ঠে রামজীবন উত্তর দিল ঃ আমার কাজ করছিলুম মহারাজ !

রাজা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ঃ সবাই কাজ ফেলে খেলা দেখতে এসেছে, তোমার মনে খেলা দেখবার কৌতূহল ওঠে নি ? ভারি আশ্চর্য্য ত !

রামজীবন বলিল ঃ কাজের ভিতরেই আমি খেলার আনন্দ পাই—সে আনন্দের তুলনা নেই।

রাজা গম্ভীর মুখে বলিলেন ঃ তুমি সেরেস্তায় যাও, তোমাকে ডেকে আমি ভুল করেছি।

রামজীবন কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই সোজা সেরেস্তার দিকে চলিয়া গেল। রাজা তখন সেরেস্তার আমলাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ আমি শুনেছি, তোমরা এই অদ্ভুত ছেলেটিকে পছন্দ কর না, অনেক বড় বড় কথা ব'লে ওকে ঠাট্টা ক'রে আঘাত দিতে চাও। কিন্তু যদি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি থাকতো, তাহলে কখনই ওকে বিদ্রূপের পাত্র বলে মনে করতে না—ওর ভিতরটা দেখে শিউরে

উঠতে। এখনই ত সবার সামনে ও স্পষ্টই জানিয়ে দিয়ে গেল—ওর আনন্দ কাজে, আর এই কথা থেকেই ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমার চোখের উপর ভেসে উঠছে।

সেরেস্তার আমলারা চুপ করিয়া রাজার কথা শুনিল; তাহার পর সেরেস্তায় ফিরিয়া রামজীবনকে ঘিরিয়া বলিল ঃ ওহে রামজীবন, আর তোমার ভাবনা নেই—রাজা তোমার ভবিষ্যৎ দেখেছেন; কিন্তু কি যে দেখলেন, সেটা আর আমাদের কাছে ভাঙ্গলেন না। তুমি পার ত রাজাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।

রামজীবন কথার কোন উত্তর দিল না; সহকর্ম্মীদের কথাগুলি তাহার কানে প্রবেশ করে নাই এমনই ভাণ করিয়া নিবিষ্টমনেই সে তাহার কাজ করিয়া চলিল। বোবার শত্রু নাই বুঝিয়া আমলারাও নিরস্ত হইল।

আট

ওদিকে নির্দ্ধারিত সেই তিনটি মাস পূর্ণ হইবার কয়েকদিন আগেই পাঠক মহাশয়ের মহাজন তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া একখানি চিঠি পাইলেন। চিঠিতে লিখা ছিল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি যেন কামদেব পাঠক মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পাওনা টাকা বুঝিয়া লইয়া আসেন। মহাজনের ত আনন্দ আর ধরে না। টাকাগুলি যে এত সহজে পাওয়া যাইবে, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। পাঠক মহাশয়ের ছেলে দুটি যদিও আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু মহাজন তাহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। যদিও ছেলেরা বলিয়াছিল যে, টাকা না নিতে পারিলে,—তাহারা নির্ব্বিচারে তাঁহার গোলামী করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে দু'টিকে তিনি ত আর সত্যসত্যই গোলামীতে বহাল করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহাকেও দ্বিধায় দিন গণিতে হইতেছিল; এ অবস্থায় পত্রে টাকা পাইবার কথা পড়িয়াই মহাজন যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িলেন।

রামজীবন ও রঘুনন্দন পুটিয়ায় আশ্রয় পাইয়াও পাঠক মহাশয়কে কোন চিঠি পত্র বা কোনরূপ খবর এ পর্য্যন্ত দেয় নাই। দুই ভাই সঙ্কল্প করিয়াছিল,—আমরা এখানে

আশ্রয় পেয়েছি, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি, কোন রকমে বেঁচে আছি—এ খবর জানিয়ে ত আর লাভ নেই। পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই আশ্রয় পায়, খায়-দায়, বেঁচে থাকে। আমাদের এভাবে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই—যতক্ষণ না আমরা পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াবো, যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবো—তার আগে আমরা কোন খবরই বাড়ীতে দেব না।

ছেলেদের কোন খবর না পাইয়া পাঠক মহাশয় ও তাঁহার সাধ্বী পত্নীও ভাবিয়া অস্থির! তাহাদের গৃহত্যাগের জন্য তাঁহারা নিজেরাই যেন অপরাধী, এমনি একটা ধারনা তাঁহাদের মনে প্রবল হইতে থাকে। আবার মধ্যে মধ্যে স্বামী স্ত্রীর অন্তরের অন্তস্থল হইতে আশার ক্ষীণ জ্যোতিটুকু ফুটিয়া উঠিয়া কতই মনোরম পরিকল্পনার সৃষ্টি করে। তখন মনের সমস্ত গ্লানি, বেদনা ও অনুতাপ যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

প্রতিবেশীরা জানে, রামজীবন ও রঘুনন্দন উপার্জ্জন করিতে গিয়াছে। তাহারা প্রায়ই পাঠক মহাশয়কে তাহা-দের বিষয় জিজ্ঞাসা করে, মহাজনের দেনা শোধ করিবার দিনটির কথা তুলিয়া যখন তখন বলে: ভালোয় ভালোয় হাঙ্গামাটা চুকলেই মঙ্গল!

পাঠক মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় রাগে। এক এক দিন অধৈর্য্য হইয়া বলেন : তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন, শুনি!

জনৈক প্রতিবেশী তম্বী করিয়া বলেন : সাধে কি আমাদের এত জ্বালা! বামুনের ছেলে দু'টোকে দেনার দায়ে যদি গোলামী করবার জন্য ধ'রে নিয়ে যায়, তখন যে আমাদেরই মাথা হেঁট হবে!

পাঠক মহাশয় মনের রাগ মনের ভিতর চাপিয়া চুপ করিয়া যান। দুশ্চিন্তার উপর প্রতিবেশীদের এই শ্লেষের আঘাত তাঁহাকে যেন মৃতকল্প করিয়া তোলে। আজ তাঁহার অক্ষমতা ও অসহায় অবস্থার এরূপ সুযোগ লইয়া ইহা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে—তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাবেই বুঝিলেন যে, ছেলেরা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই।

দেখিতে দেখিতে সেই সাংঘাতিক দিনটি আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠক মহাশয়ের প্রতিবেশীরা গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া অতি সন্তর্পণেই লক্ষ্য করিয়াছে যে, রামজীবন ও রঘুনন্দন গৃহে ফিরে নাই। সকাল হইবা মাত্রই তাঁহারা পাঠক মহাশয়ের বাড়ীর আশে পাশে থাকিয়া

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—কখন সেই মহাজন আসিয়া উপস্থিত হয়, একটা অনর্থ ঘটে।

অধিকক্ষণ তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইল না একটু বেলা হইতেই মহাজন ব্যগ্রভাবে পাঠক মহাশয়ের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে তাঁহার অনেকটা পিছনে থাকিয়া বলিষ্ঠ দেহ দুইজন লোক আস্তে আস্তে তাঁহাকে যেন অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। প্রতিবেশীরা বুঝিলেন, মহাজন আজ একা আসে নাই, একটা হাঙ্গামা বাধাইবার জন্য দুই জন যোয়ান অনুচর সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে।

পাঠক মহাশয় বাড়ীর ভিতরে পূজার ঘরে বসিয়া এক-মনে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। মহাজনের আহ্বানে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

স্ত্রী আসিয়া ধরা গলায় বলিলেন ঃ ওগো, সেই মহাজন মিন্‌সে এসেছে, তোমায় ডাক্‌ছে। কি হবে?

পাঠক মহাশয় বলিলেন ঃ ছেলে দুটো বাপের কষ্ট দেখে অমন শক্ত শপথ করেছিল—তা কি ভগবান শোনেন নি! এতক্ষণ তাঁকেই একথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। তিনি ত থাকেন মানুষের দেহে, মানুষের মনের ভিতরে। তাঁর

ইচ্ছা হ'লে দুর্ম্মুখ ঐ মহাজন সদয় হ'তে কতক্ষণ ! সেই প্রার্থনাই করছিলাম ।

পাঠক মহাশয় বাহিরে আসিয়া মহাজনকে দরজার পাশে ছোট দাওয়াটির উপর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। মহাজন পাঠক মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেনঃ টাকা আপনি যোগাড় করতে পেরেছেন জেনে ভারী খুশী হয়েছি। খৎখানা আমি সঙ্গে করেই এনেছি ; সুদে আসলে আমার পাওনা হচ্ছে—বাইশ টাকা সাড়ে বারো আনা। দু'টো পয়সা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বাইশ টাকা বারো আনা আপনি দিন, আমি 'বুঝে পেলুম' লিখে খৎখানা আপনাকে ফিরিয়ে দিই ।

পাঠক মহাশয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মহাজনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। টাকা তিনি যোগাড় করিয়াছেন ঋণ পরিশোধের জন্য—এ খবর তাহাকে কে দিল ! তবে কি তাঁহার পরম হিতৈষী প্রতিবেশীদের কেহ মজা দেখিবার আশায় এই মিথ্যা সংবাদটি দিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার রাস্তাটি আরও পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন ! এখন এ কথার উত্তরে মহাজনকে তিনি কি বলিবেন ?

যাহা বলিতে গেলেন, কণ্ঠ দিয়া তাহা বাহির হইল না ; গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। কথা বাহির হইবে

কেমন করিয়া ! বার দুই কাসিয়া গলাটি একটু সরস ও পরিষ্কার করিয়া পাঠক মহাশয় বলিলেন ঃ টাকা ত যোগাড় হয়নি, বাপু ! ছেলেরা টাকার সন্ধানে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফিরে নাই !

মহাজন বুঝি আকাশ হইতে পড়িলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ঃ বটে, চালাকী আমার সঙ্গে ? জোচ্চুরীর আর যায়গা পান-নি।

প্রতিবেশীরা এ সময় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ওদিকে যে-দুইজন ষণ্ডা-চেহারার লোক মহাজনের পিছনে পিছনে আসিতেছিল, মহাজনকে পাঠক মহাশয়ের দাওয়ায় বসিতে দেখিয়া নিকটে রাস্তার ধারে একটি জামগাছের গায়ে ঠেস দিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চোখ ও কান পড়িয়াছিল দাওয়ার দিকে। মহাজনের হুমকি শুনিয়া এবং এতগুলি লোককে ভীড় করিয়া দাওয়াটি ঘিরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহারা উভয়েই সচকিত হইয়া উঠিল। তখনই দুই হাতে উৎসুক লোক-দিগকে সবলে সরাইয়া দিয়া তাহারা দাওয়াটির কাছে মহাজনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। জনতার লোকেরা ভাবিল যে, যোয়ান দুইটি মহাজন-প্রভুকে সাহায্য করিতে

আসিয়াছে, এখনই হয় ত দাম্ভিক পাঠককে অপমান করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের মধ্যে একজন মহাজনের মুখের উপর তাহার সবল হাতের মোটা আঙ্গুলটি তুলিয়া ধমক দিল: চুপ! ছোট মুখে বড় কথা ব'লবে না, আমরা তা সইব না।

অপর লোকটি বলিল: এঁর ছেলেরা তোমাকে কথা দিয়েছেন, তুমি মেনে নিয়েছ। এখন এঁর উপর এত খাপ্পা হচ্চ কেন? সময় কি বয়ে গেছে! পাঠক ঠাকুরকে তুমি তম্বী কর্‌বার কে?

মহাজন ত ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন! লোক দুইটির চেহারা দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহারা মনে করিলে তাঁহাকে তুলিয়া আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারে! কিন্তু গরীব ব্রাহ্মণ—এমন দুই যোয়ান কোথা হইতে যোগাড় করিল? তবে কি তাহার মনে অন্য কোন মতলব আছে? মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু প্রথম যোয়ান তাঁহাকে পুনরায় ধমক দিয়া বলিল: চুপ! আর কোন কথার দরকার নেই। টাকা নিয়েই ত তোমার কথা? যারা তোমাকে তিন মাস আগে কথা দিয়েছিল, তারা কথার লোক—সে কথা রাখবার

জন্য তারা তোমার পাওনা টাকা হিসাব করে পাঠিয়েছে আমাদের হাতে—এখন বুঝে নাও।

দ্বিতীয় যোয়ান তখন একটা থলি বাহির করিয়া গণিয়া গণিয়া বাইশ টাকা সাড়ে বারো আনা মহাজনের হাতে তুলিয়া দিল। মহাজন যেন এবার হাতে স্বর্গ পাইলেন। একগাল হাসিয়া বলিলেন: আমিও ত তাই ভাবছিলাম, এমন খবর কি কখনো মিছে হতে পারে! কিন্তু পয়সা দু'টো আমি আর নেব না—ছেড়ে দেব বলেছি।

লোকটি বলিল: থাক্! একটা কাণা কড়ি তোমাকে ছাড়তে হবে না। তারা ভিখারী নয়—তোমার দয়ার প্রত্যাশা করে না। এখন খতে ঐ টাকা সমস্ত বুঝে পেয়েছ লিখে দিয়ে পাঠক ঠাকুরকে ফেরৎ দাও।

তখনই বাড়ীর ভিতর হইতে দোয়াত কলম আসিল। মহাজন মহানন্দে কথাগুলি লিখিয়া খৎখানি পাঠক মহাশয়ের হাতে দিল; তাহার পর তাঁহার পদতলে মাথা নত করিয়া পদধুলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিল: অনেক কু-কথা বলেছি ঠাকুর, সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করবেন; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আপনার ছেলে দু'টি রাজা হোক।

ইহার পর সেই দু'টি লোক পাঠক মহাশয়কে প্রণাম করিয়া একান্ত বিনীতভাবে জানাইল: শুনুন—ঠাকুর-

মশাই! আপনার ছেলেরা উপার্জ্জনের টাকায় এই দেনা শোধ করেছেন। আর, আপনার সেবার জন্য চারিটি টাকা আলাদা পাঠিয়েছেন। এখন থেকে প্রতি মাসে আপনার কাছে চারিটি করে টাকা আসবে। ওঁদের উন্নতি হলে আরও বেশী টাকা পাঠাবেন।

পাঠক মহাশয় এতক্ষণ বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, ইহা সত্য, কিম্বা তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! কিন্তু টাকা চারিটি যখন তাঁহার হাতে আসিল, তখন তিনি শিহরিয়া উঠিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এমন করে কোন ছেলে উপার্জ্জন করেনি! ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

প্রতিবেশীরা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, ঘটনার এমন বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তাহাদের মুখগুলা যেন ছাইয়ের মত ফ্যাঁকাসে হইয়া গেল। বুঝিল কামদেব পাঠক চিরদিন তাদের উপর টেক্কা দিয়া আসিয়াছে, এখন আবার তাহার জিতের পালা পড়িল; সে এবার ধরাকে সরা দেখিবে।

আগন্তুক দুইজনকে ধরিয়া তাহারা রামজীবন ও রঘুনন্দনের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে চাহিল। কোথায় আছে, কি কাজ করিতেছে, কত বেতন পাইতেছে—

এমন কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু লোক দুইটি এমনই চাপা যে, কোন কথাই প্রকাশ করিল না; শুধু জানাইল যে, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, সময়ে সবই জানতে পারবেন।

দুই ভাই পিতামাতাকেও তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বা কর্ম্মকথার কিছুই জানায় নাই। তাঁহারা শুধু এইটুকুই জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, তাহারা মানুষ হইবার জন্য সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। মানুষের মত মানুষ হইয়া তবে দেশে ফিরিবে। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শুধু এই আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তাহাদের জীবনের স্বপ্ন যেন সত্য হয়।

পিতামাতা উভয়েই চোখের অশ্রু মুছিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন ঃ আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক; তোমরা দু'টি ভাই বংশের মুখ—দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

—

নয়

রামজীবন যেমন একাগ্রচিত্তে সেরেস্তার কাজে লিপ্ত হইয়া কাজকর্ম্ম সুচারুরূপে শিখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল, রঘুনন্দনও তেমনি উত্তমরূপে বিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিল। ফারসী তখন রাজভাষা; এই ভাষা ভাল করিয়া শিখিতে না পারিলে সেকালে সরকারী বা সওদাগরী দপ্তরে কেহ কোন চাকুরী পাইত না। পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে ফারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইতে হইত। রঘুনন্দন তাহার অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায়ের বলে চারি বৎসরের মধ্যে ফারসী ভাষা এমন করিয়া শিখিয়া লইল যে, তাহার শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তাহার হাতের লেখা, উচ্চারণ-ভঙ্গি এমন সুন্দর ও কেতাদুরস্ত যে, রাজা দর্পনারায়ণ পর্য্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন: হিন্দুদের মধ্যে নবাব সরকারে সকলেই আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফারসীনবীস ব'লতো; কিন্তু এখন দেখছি, তুমি আমাকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছো। তোমার এ প্রতিভার স্থান আমার এই ছোট সেরেস্তা নয়, তুমি যাতে নবাবের সেরেস্তায় ঢুকে অবস্থা ফেরাতে পারো—তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

অল্প দিনের মধ্যে সেই ব্যবস্থাই রাজা করিয়া দিলেন। যদিও তিনি দেওয়ানের পদে ইস্তফা দিয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি নবাব-সরকারে তাঁহার সুপারিসেই রঘুনন্দন ঢাকার সরকারী সেরেস্তায় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে মীর মুন্সীর পদে বাহাল হইল।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, এই সময় ঢাকা ছিল বাঙ্গালার রাজধানী। বাদশাহ ঔরংজীব ভারতবর্ষের সম্রাট এবং তাঁহার পৌত্র সাহাজাদা আজিম ওসান বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার পদবী—নবাব নাজিম। কিন্তু তিনি দেশরক্ষা ও শাসনাদি ব্যবস্থার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও, রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের কর্ত্তা ছিলেন বাদশাহের প্রিয়পাত্র মুরশিদ কুলি খাঁ; তাঁহার পদবী ছিল—নবাব দেওয়ান। নবাব-নাজিম আজিম ওসান অত্যন্ত অপব্যয়ী ছিলেন বলিয়া বাদশাহ হুকুম দিয়াছিলেন যে—নবাব-দেওয়ানের মঞ্জুরী ভিন্ন নবাব-নাজিম কোন কিছু ব্যয়বরাদ্দ করিতে পারিবেন না।

নবাব দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁর সেরেস্তাও স্বতন্ত্র ছিল। সেই সেরেস্তার কর্ম্মকর্ত্তা বা কানুনগো যিনি ছিলেন, তাঁহারও নাম দর্পনারায়ণ। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাজা দর্পনারায়ণ ছিলেন ব্রাহ্মণ, আর ইনি

কায়স্থ। রঘুনন্দন ইহাঁরই অধীনে মীর মুন্সীর পদে বাহাল হয়।

রামজীবন কনিষ্ঠের এই পদপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। এই কয় বৎসরে রামজীবনেরও বেতন বাড়িয়া একুশ টাকা হইয়াছিল। সুতরাং রাজার দেনা শোধ করিয়াও রামজীবন তাহার পিতার সকল অসুবিধা ও সাংসারিক অস্বচ্ছলতা মোচন করিতে পারিয়াছিল। সামান্য একটি ব্যাপারে রামজীবনের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। হিসাবের একটা ভুলের জন্য একদা বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। রামজীবনের অধীনস্থ একজন নূতন মুহুরীকে সেই ভুলের জন্য দায়ী করিয়া দেওয়ান তাহাকে রাজার নিকট দণ্ডের জন্য পাঠাইয়া দেন। রামজীবন এ সময় সেরেস্তার কোনও কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে এই ঘটনার কথা শুনিল। এই সময় সেই মুহুরী সেরেস্তায় ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল—'রাজা আমাকে জবাব দিয়াছেন।' রামজীবন জানিত,—বেচারীর অবস্থা খুবই খারাপ; এই চাকুরীটি পাইয়া সে বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিল। রামজীবনের মানসপটে যেন তাহার পারিবারিক দুর্দ্দশার ছবিগুলি ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থার সহিত সে

তাহার তুলনা করিয়া ভাবিল,—'আমিও যদি এইভাবে কর্ম্ম-চ্যুত হইতাম, তখন আমার অবস্থা কি হইত ? আমার মনটাও কি এইভাবে ভাঙ্গিয়া যাইত না !' এই ভাবনাটুকুর সঙ্গে সঙ্গে সে রাজার নিকট ছুটিয়া গেল ; রাজা তখন অন্তঃপুরে যাইবার জন্য উঠিতেছিলেন। রামজীবন হাত দুইখানি জোড় করিয়া বলিল,—'এই মাত্র আপনি মুহুরীকে যে ভুলের জন্য দণ্ড দিলেন, সে ভুল প্রকৃতপক্ষে আমার ; মুহুরী নকলনবীস মাত্র, আমার লিখা হিসাব সে নকল করেছিল। আপনি তাকে কাজে বাহাল করুন, আর তার দণ্ড আমাকে দিন।'

রাজা স্তব্ধভাবে রামজীবনের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। বুঝিলেন, ইহা তাহার অভিনয় নয়, অন্তরের অভিব্যক্তি। রামজীবনের মুখে দৃঢ়তার আভা সুস্পষ্ট। বিচক্ষণ রাজা মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রামজীবন সত্যই যদি ভুল করিয়া থাকে, এ অবস্থায় তাহা স্বীকার করিয়া সে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছে। আর এই ভুলের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও এই কর্ম্ম-চ্যুত হতভাগ্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় যে ভাবে সে দণ্ড গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, তাহাও অতুলনীয়। তথাপি রাজা তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন

—'আমি যদি তোমাকে এখনই কর্ম্মচ্যুত করি, রাম-জীবন ?'

রামজীবন উত্তর দিল—'আমি বহু মানে আপনার দণ্ড মাথা পেতে নেব, রাজা ! আমি আপনার বিচারের প্রশংসা করে নিজের অক্ষমতাকেই দায়ী করবো ।'

রাজা তখন প্রসন্ন মনে স্নেহের সুরে বলিলেন,—'তুমি দণ্ডের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছ, রামজীবন ! আমার সাধ্য কি তোমাকে ধরি ! আমার বিচারে তুমি অপরাধি নও, তুমি মহৎ । আমি তার দণ্ড মাফ্ করলুম ।'

রামজীবনের এই মহত্ত্বের কথা স্তব্ধ হইয়া সকলেই শুনিল। যাহারা গোড়া হইতেই তাহার হিংসা করিত, আজ তাহারাও বুঝিতে পারিল—বয়সে ছোট হইলেও কেন রামজীবন আর সব বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা এত বড় !

ওদিকে ঢাকায় দেওয়ানের সেরেস্তায় রঘুনন্দনও অল্প দিনের মধ্যেই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস ও বাকপটুতার পরিচয় দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইল। বিচক্ষণ দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ দেখিলেন—প্রতিভার একটা উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ যেন তাঁহার সেরেস্তায় আসিয়া তাহার আড়ষ্টতা কাটাইয়া দিয়াছে। যেমন তাহার বলিষ্ঠ সুন্দর

চেহারা, তেমনই সে সাহসী ও সপ্রতিভ; বিদ্যা এবং বাকপটুতায়ও তাহার কুণ্ঠা নাই। সেরেস্তার পুরাতন কর্ম্মচারীরাও যে ব্যাপারে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত, এই তরুণ নির্ব্বিচারেই তাহাতে যোগ দিতে প্রস্তুত। নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া মুরশিদ কুলি খাঁ দেখিলেন,—তিনি এতদিনে মনের মতন এক মজবুত মানুষ পাইয়াছেন।

এই সময় নবাব-নাজিম আজিমওসানের সহিত মুরশিদ খুলি খাঁর খুবই মনোমালিন্য চলিতেছিল। অথচ, রাজ্য-সম্পর্কে তাঁহাদের সেখাসাক্ষাৎ ও পরামর্শ না হইলেই নয়। কিন্তু আজিমওসানের মনে মুরশিদ কুলিখাঁর সম্বন্ধে এমনই একটা বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, একটু সুযোগ পাইলে সকলের সমক্ষেই তাঁহাকে অপদস্ত করিয়া বসিতেন। এজন্য বুদ্ধিমান মুরশিদকুলিখাঁ ও আজিমওসানের দরবারে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া তাঁহার কানুনগো রায় দর্পনারায়ণকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইয়া প্রয়োজনীয় আলোচনা চালাইতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মুরশিদকুলি খাঁ সন্দেহ করিলেন, তাঁহার কানুনগো আজিমওসানের দলে ভিড়িয়া গিয়াছেন। এমন কি তাঁহাকে সরাইবার জন্য আজিমওসান যে ষড়যন্ত্র করিতেছেন—তাহাতে কানুনগো দর্পনারায়ণেরও যোগ আছে। তিনি কানুনগোর উপর হাড়ে

হাড়ে চটিয়া গেলেন এবং তাহাকে জব্দ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় তাঁহার নজরে পড়িল—প্রিয়দর্শন মীর-মুনসী রঘুনন্দন! প্রথমতঃ তিনি রঘুনন্দনকে লইয়া নানা প্রকার [illegible] আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন আবার তাঁহার অপেক্ষাও চতুর। সে দেওয়ানের আসল উদ্দেশ্যটি বুঝিয়া সেইভাবে প্রস্তুত হইল। ঘটনাচক্রে এই সময় রায় দর্পণারায়ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, সেরেস্তায় আসা বা আজিমওসানের দরবারে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। দেওয়ান তখন রঘুনন্দনকে বুঝাইয়া পড়াইয়া আজিমওসানের দরবারে পাঠাইলেন।

চতুর রঘুনন্দন রাজ্যের দুই বড় কর্ত্তার মনোমালিন্য ও তাঁহাদের মনোগত অভিসন্ধিগুলির সুড়ুক সন্ধান ভালো করিয়াই জানিয়া লইয়াছিল। সে তখন এমন কৌশলে কাজ আরম্ভ করিল যে, দুই কর্ত্তাই যাহাতে হিতৈষী অনুরক্ত জানিয়া তাহাকে সাদরে কোলে টানিয়া লন। বাল্যকাল হইতেই রঘুনন্দনের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। শিক্ষার সহিত সেই বুদ্ধি আরও প্রখর হইয়া উঠে। বিদ্যার সহিত সে বুদ্ধিরও চর্চ্চা করিত এবং বুদ্ধির সাহায্যে কাজ উদ্ধার করিবার কত ফন্দীই তাহার মাথায় খেলিত। কার্য্যক্ষেত্রে

প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অদৃষ্টে এই বুদ্ধি বিকাশের সুযোগ ঘটিল। মুরশিদকুলি খাঁ বিশ্বাস করিয়া রঘুনন্দনের কানে কূটবুদ্ধির মন্ত্র দিলেন—কেমন করিয়া নিজের উদ্দেশ্যটুকু গোপন রাখিয়া মুখের কথায় মধু ছড়াইয়া কাজ উদ্ধার করিতে হয় ও অন্যের মনের উদ্দেশ্যটুকুও জানিতে পারা যায়। এইভাবে দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ পাইয়া রঘুনন্দনের অন্তর নাচিয়া উঠিল, সে বুঝিল—ভগবান তাহাকে তাহার উপযুক্ত সুযোগ দিয়াছেন।

প্রথম সাক্ষাতেই রঘুনন্দন সাহাজাদা আজিমওসানের প্রীতিভাজন হইল। এই প্রিয়দর্শন বাকপটু শিষ্টাচারসম্পন্ন তরুণ প্রতিনিধিটিকে তিনি খুব প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করিলেন। রঘুনন্দন প্রতি কথায় সাহাজাদার প্রাধান্যটুকু স্বীকার করিয়া এমন কৌশলে দেওয়ানের প্রস্তাবগুলি অনুগত প্রার্থীর মত উত্থাপন করিল যে, সাহাজাদা তাহা স্বীকার না করিয়া পারিলেন না। দেওয়ানও রঘুনন্দনের সফলতায় চমৎকৃত হইলেন। তিনি জানিতেন, এই প্রস্তাবগুলি সাহাজাদার মজলিসে তিনি স্বয়ং গিয়া যদি উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলেই তুমুল বিতর্ক উঠিত, ফলে কোন কাজই হইত না।

আর যদি তাঁহার কানুনগো দর্পনারায়ণ প্রস্তাবগুলি

লইয়া যাইতেন, দিনের পর দিন পড়িত, অন্ততঃ একটি মাসের কমে তাহার নিষ্পত্তি হইত না। কিন্তু রঘুনন্দন সদ্যোসদ্যোই কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল। দেওয়ানের সমক্ষে রঘুনন্দন তাঁহার অনকূলে এমন কৌশলে কথা বলিল যে, কূটবুদ্ধির পাহাড়বিশেষ অত বড় ঝুনো রাজনীতিক মুরশিদকুলিখাঁও মাত হইয়া গেলেন। তিনি সাব্যস্ত করিয়া লইলেন, এই বুদ্ধিমান যুবা সাহাজাদার দুর্ব্বলতা কোথায়—তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছে। চাবি-কাটিটি যে তাঁহার হাতে—তাহাও সে ভালোরূপেই বুঝিয়াছে। এখন ইহাকেই উপযুক্তভাবে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে।

এই ঘটনার পরই রঘুনন্দনের ভাগ্যোদয় হইল। দেওয়ানের সহকারীরূপে নবাব নাজিমের দরবারে কথাবার্ত্তা চালাইবার মত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিয়া দেওয়ান তাহার পদোচিত পারিশ্রমিকের হার মাসিক হাজার এক টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেম! তখনকার দিনে এই টাকা বর্ত্তমানের বিশ হাজার টাকার সমতূল্য একথা মনে রাখিতে হইবে।

কিন্তু নিজের এই অপ্রত্যাশিত পদোন্নতি রঘুমন্দকে তৃপ্তি দিতে পারিল না; জেষ্ঠ্যের জন্য তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবশ্য এখন ইচ্ছা করিলেই সে তাহার সেরেস্তায় দাদাকে আনাইয়া যে কোন একটা ভালো

রকমের চাকরীতে নিয়োজিত করিতে পারে ; কিন্তু তাহার সম্মানভাজন অগ্রজকে তাহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারীর পদে বসাইতে তাহার অন্তর কিছুতেই সায় দিল না। অথচ, তাহার দাদা পুঁটিয়ার সেরেস্তায় মুহুরীর কার্য্য করেন, ইহাও তাহার সহ্য হইতেছিল না। দাদার উপযুক্ত কার্য্যের জন্য সে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু উভয় ভ্রাতার ভাগ্যাকাশ তখন সাফল্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ; সুতরাং অপ্রত্যাশিত ভাবেই সুযোগ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল। সাহাজাদা আজিমওসান এই সময় তাঁহার সেনাবিভাগের সম্পর্কে একজন সুদক্ষ হিসাবনবীস কর্ম্মচারীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সেনাদলের বেতন, রসদ, সমর-সরঞ্জাম প্রভৃতির যাবতীয় ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব এই কর্ম্মচারীকে গ্রহণ করিতে হইবে ; তিনি প্রধান সামরিক কর্ম্মচারীর পদমর্য্যাদা পাইবেন। অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রচালনায়ও তাঁহার কৃতিত্ব থাকা প্রয়োজন। বহুলোক পরিচালনার ক্ষমতা, সাহস, উপস্থিতবুদ্ধি, অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতায় তাঁহাকে অগ্রণী হইতে হইবে, এই দুর্লভ গুণগুলির উপর তিনি নিশ্চয়ই বলিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন হইবেন। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি অল্পই পাওয়াযায়।

রঘুনন্দন এই কর্ম্মখালির সংবাদ পাইয়াই স্থির করিয়া ফেলিল—এই তাহার দাদার উপযুক্ত পদ। সে যেমন নবাব-দেওয়ানের সেরেস্তার শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, নবাব-নাজিমের সেরেস্তার এই দায়িত্বপূর্ণ প্রধান পদটিতে যদি তাহার দাদাকে বসাইতে পারে, তাহা হইলেই তাহাদের দুই ভ্রাতার জীবনের স্বপ্ন সফল ও সত্যে পরিণত হইবে।

রঘুনন্দন তৎক্ষণাৎ সকল কথা জানাইয়া রাজা দর্পনারায়ণকে পত্র লিখিল এবং তাহার দাদার এই পদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিল। নিজের ভাগ্যোদয়ের সময়ও রঘুনন্দন রাজার নিকট সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিল।

রাজা দর্পনারায়ণ আহ্লাদের সহিত রামজীবনকে ঢাকায় পাঠাইলেন এবং সেই সঙ্গে তাহার সম্বন্ধে একখানি সুপারীস পত্রও লিখিয়া দিলেন। পুঁটিয়ায় আসিয়া রামজীবন ও রঘুনন্দন দুই ভ্রাতাই অশ্বারোহণ, অস্ত্রচালনা ও রণকৌশল রাজপুত্রদের সাহচর্য্যে শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সে শিক্ষা আজ তাহার কর্ম্মপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিল।

যথাসময় রামজীবন ঢাকায় আসিয়া ভ্রাতার বাসায়

উঠিল। রঘুনন্দন এখন রাজধানীর একজন মহাসম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। নবাব সরকার হইতে বাসের জন্য সে প্রাসাদতুল্য বাসা পাইয়াছে। বাসায় পাচক, চাকর, লোকজন গিস্ গিস্ করিতেছে। পদস্থ ভ্রাতার অগ্রজরূপে রামজীবনও সকলের নিকট সম্মান পাইল।

রঘুনন্দন আজিমওসানের প্রকৃতি ভালো করিয়াই জানিত। সে রামজীবনকে বলিল,—দাদা, সাহাজাদা সুন্দর চেহারা আর আদপ কায়দার ভারি ভক্ত। জাঁকজমকও তিনি খুব পছন্দ করেন। আবার নবাব-দেওয়ান এ-সবের সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি পোষাকে জাঁকজমক বা খরচের বাড়াবাড়ি মোটেই ভালো বাসেন না। আমাকে কিন্তু দুজনেরই মন রেখে চলতে হয়।

রামজীবন হাসিয়া বলিল—বুঝিছি, তুমি দেওয়ানের কাছে খুব মিতব্যয়ী ও হিসিবি মানুষ হয়ে থাকো, আর নাজিমের দরবারে গিয়ে বেহিসিবি ও দিলদরিয়া হও।

রঘুনন্দন বলিল—এখানে যোগ্যতার চেয়ে যোগাড়ের মর্য্যাদা বেশী। কত অযোগ্যই সুপারিসের জোরে তরে যাচ্ছে। তবে দেওয়ান এসব বিষয়ে খুব শক্ত। তাহলেও দুই সেরেস্তাতেই বুদ্ধির জয়জয়কার দাদা! বুদ্ধির জোরেই আজ আমি এত বড় পদ পেয়েছি, তোমাকেও বুদ্ধি খেলিয়ে

এই পদ দখল করতে হবে। তাহলেই আমাদের ছোট বয়সের আশা আকাঙ্খা সবই সফল হবে।

আজিমওসানের দরবারে রঘুনন্দনের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। দাদার কর্ম্মপ্রাপ্তির পথে যাহা কিছু অন্তরায় ছিল, বুদ্ধির জোরে সে সকল নিশ্চিহ্ন করিয়া সে একদিন উপযুক্ত সময়ে রামজীবনকে সাহাজাদার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

রঘুনন্দনের পরামর্শ মত রামজীবন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর উপযুক্ত মূল্যবান পরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া সসম্ভ্রমে সাহাজাদাকে যেই কুর্নিশ করিল, রঘুনন্দন অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—ইনি আমার দাদা, বাঙলাদেশে এঁর মত হিসিবি মানুষ খুব কমই আছে। সা'জাদা যে রকম দক্ষ লোক খুঁজছেন, এঁকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সব বিষয়েই ইান করিৎকর্ম্মা লোক।

রামজীবনের বীরোচিত আকৃতি দেখিয়াই সাহাজাদা প্রীত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ রঘুনন্দনের উপর তাঁহার বিশ্বাস এতই গভীর যে, তাহার কথাগুলি তিনি অভ্রান্ত বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। ইহার উপর রামজীবন যখন রাজা দর্পনারায়ণের সুপারিশপত্র সাহাজাদার নিকট পেশ করিল, তিনি তাহা পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন—'বহুত খুব।

কিন্তু এর আর দরকার ছিল না। তোমার চেহারা আর তোমার ভাই রঘুনন্দনের সুপারিস আমাকে খুশী করিয়াছে। তোমার আরজি মঞ্জুর। তোমার ভাইয়ের মত তুমিও যে খুব বাহাদুর—তোমার কাজ দেখেই আমরা তা নিশ্চয়ই জানতে পারবো।'

সবিনয়ে কুর্নিশ করিয়া রামজীবন বলিল,—'যথাশক্তি আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করবো জাঁহাপানা।'

দশ

কয়েক বৎসর পরের কথা।

প্রতি বৎসরেই দুই ভ্রাতা সমান গতিতে উন্নতির সোপানশ্রেণী বাহিয়া ধাপে ধাপে উঠিয়াছে। তাহার কাহিনী আরও বিস্ময়কর।

আজিমওসান রঘুনন্দনের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য তাহাকে "রায় রাইয়া" উপাধি দিলেন। সেকালে উপাধির সঙ্গে উপাধির উপযুক্ত বিত্তের ব্যবস্থাও থাকিত। রঘুনন্দন রাজসাহী জিলার ভিতর সুবৃহৎ একটি জমিদারী সেই সঙ্গে খেলাৎ পাইল।

উপাধি পাইয়া রঘুনন্দনের মন মুসড়াইয়া গেল। তাহার দাদার কোন উপাধি নাই, অথচ সে কেমন করিয়া এই উপাধি নিজের নামের সহিত যোগ করিবে। কিন্তু তাহার এই দুশ্চিন্তারও শীঘ্রই আশ্চর্য্য ভাবে অবসান হইয়া গেল।

এই সময় জমিদার উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী হইয়া সমগ্র সুবায় বিভীষিকা উপস্থিত করেন। এই বিদ্রোহ দমনে যে সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়, রামজীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থাকে। নবাব-নাজিম এই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় রামজীবনের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত

হন। উদায়নারায়ণের পতনের পর তাঁহার বিশাল জমিদারীর সনদ নদীয়ার মহারাজাকে দিবার জন্য নবাব-দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ ইচ্ছুক থাকিলেও, নবাব-নাজিম আজিমওসান তাহা বাতিল করিয়া রামজীবনকে প্রদান করিলেন। উদয়-নারায়ণ রাজা ছিলেন, সুতরাং আজিমওসান রামজীবনকেও 'রাজা' উপাধি দিলেন। রঘুনন্দনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

ইহার পর রাজা সীতারামের সঙ্গে নবাবের যে সব সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, রামজীবনের বুদ্ধিকৌশলেই সে সব যুদ্ধে নবাব সেনা অতিকষ্টে জয়লাভ করে। ইহার ফলে নবাব রাজা সীতারামের অধিকৃত ১৮-টি বিখ্যাত পরগণার সনদের সহিত রামজীবনকে মহারাজা উপাধি দিয়া কৃতিত্বের পুরস্কার দিলেন।

যে দুইটি ছেলে একদা ঋণগ্রস্থ পিতার কষ্ট মোচনের জন্য অসহায় ও নিঃস্বম্বল অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছিল, কিছুকাল পরে যৌবনের বিপুল গৌরবে যেদিন তাহারা জন্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তাহারা বাঙ্গালা দেশের এক তৃতীয়াংশের অধিশ্বর। এক সময় কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ভিন্ন অন্য কোন ভূসম্পত্তিই যাহাদের ছিল না—এখন মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম, মালদহ,

ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি সকল জিলা ব্যাপিয়া তাহাদের বিপুল ভূসম্পত্তি; অনেকগুলি সমৃদ্ধ পরগণার তাহারা অধিপতি এবং দুই ভাইয়ের উপাধি মহারাজা ও রায় রাইয়াঁ।

দেশে যখন তাহারা ফিরিল—পৈতৃক সে পর্ণ টীর কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে!—আমহাটির সন্নিহিত বহুবিস্তৃত বিশাল ভাতঝড়া বিল ভরাট করিয়া যে মনোরম নগরী ও চক্ষুচমৎকারী রাজপ্রসাদ গড়িয়া উঠে তাহার নাম হইল—নাট্যপুর বা নাটোর।

পিতা মাতার সকল দুঃখ ঘুচাইয়া অতুল ঐশ্বর্যে উপর তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চমৎকৃত প্রতিবেশীদে চোখের উপর ইহারা তুলিয়া ধরিল—নিজেদের অপূর্ব্ব জীবন-চিত্র;—স্পষ্ট করিয়া তাহা শুধু ব্যক্ত করিতেছিল—আমরা ছেলে—বাঙলার নির্ভীক ও দুঃসাহসী ছেলে; আমরা দুটিভাই

শেষ